পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য

আমার নাট্যমোদিনী তিন ভগিনী
ফিরদৌস, বানু ও রাহেলাকে

পলাশী ব্যারাক

চরিত্র

হাবিব

মারুফ

মফিজ

হাফিজ

তোফাজ্জল

কামাল

পিওন

স্থান : পলাশী ব্যারাক, ঢাকা

কাল : ১৯৪৮ইং

দৃশ্য : একটি ঘরে ছটা ছোট ছোট চৌকি। মঞ্চের পেছনের দিকে দুটো সম্পূর্ণ দেখা যাবে, বাকিগুলোর বিভিন্ন অংশমাত্র উঁকি দেবে। ঘরের দেয়াল বাঁশের বেড়া। মেঝে, লম্বা তক্তার ফালি দিয়ে কোনো রকমে গেঁথে রাখা হয়েছে। সব কিছুই নড়বড়ে, হরেক রকম শব্দ মানুষজন নড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সাক্ষ্য দেয়।

সময়, ভোরের দিক। সদ্যছাড়া বিছানার অবস্থা অত্যন্ত অগোছালো। বেশিরভাগই লুঙ্গি পরে আছেন, কারও গায়ে শার্ট আছে, কারও গায়ে শুধু গেঞ্জি।

চাদর জড়িয়ে জুবুথুবু হয়ে বসে মারুফ অত্যন্ত গভীর মনোযোগের সঙ্গে একটা বই পড়ছে। চোখে পুরু চশমা। ক্ষীণ স্বাস্থ্য। অন্য একটা চৌকিতে বসে মফিজ পা দোলাচ্ছে। নিজের মনের কোনো ব্যক্তিগত অশান্তিতে পুড়ে মরছে, নিরীক্ষণ করছে মারুফের নির্বিকার শান্ত আত্মতৃপ্ত ভাবখানা, আর আরও জ্বলে উঠছে হিংসায়। একটু দেখছে, মুখ খিচিয়ে একটু হাঁটছে, আবার বসছে। টুথপেস্ট ও বদনা হাতে নিয়ে ঝড়ের বেগে, চারদিক কাঁপিয়ে, ঘরে প্রবেশ করল হাবিব। ঠক করে হাতের জিনিসগুলো রাখল, বদনাটা উল্টে ফেলে দিল মেঝের ওপর। সটান এসে দাঁড়াল ঠিক মারুফের মাথার ওপর; ঝুঁকে পড়ে মারুফকে দেখতে থাকে। জোরে একবার নিঃশ্বাস টেনে নেয়, চওড়া চোয়াল আরও বিস্তৃত করে। গরগর করে ওঠে একটা চাপা আক্রোশে। মফিজ কিছু না বুঝে উৎসুক হয়ে ওঠে। হাবিব আচমকা মারুফের হাতের বই হ্যাঁচকা টানে ছিনিয়ে পাশের চৌকির ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়-]

হাবিব : আপনি অঙ্ক শাস্ত্রের কৃতি ছাত্র, না ? ধরুন এই কাগজ আর কলম। নিন, হাতে নিন। ফ্যাল ফ্যাল করে ও-রকম হাবাগোবা ভাব দেখালেই হলো, না ? নিন বলছি কাগজ আর কলম!

মারুফ : (হতভম্ব) তা তা তা আ- কিন্তু আমি যে-

হাবিব : করুন, হিসেব করুন। দেখি আপনি কত বড় জাঁদরেল ম্যাথমেটিশিয়ান। প্রতি ঘর প্রস্থে চোদ্দ হাত দৈর্ঘ্যে পনের হাত, প্রতি ব্লকে পঁচিশটা ঘর, প্রতি ঘরে দশজন করে মানুষ, সবগুলো ব্যারাক মিলিয়ে এখানে থাকে চার হাজার কর্মচারী। এক একটা ব্লকের জন্য মাত্র একটা করে কল, তাতে পানি থাকবে সকাল সাতটা থেকে দশটা অবধি, কলের মুখের ব্যাস কোয়ার্টার ইঞ্চি, পানি পড়বে ঝির ঝির করে-

মারুফ : এ্যাঁ!

হাবিব : এ্যাঁ নয়, হিসেব করুন। অঙ্ক করে বলুন ঐ পানি দিয়ে মুখ ধোবার আমার কোনো হক আছে কি নেই। হিসেব করে আপনাকে বলতে হবে ঐ পানি অফিসে যাবার আগে আমার রুহ দেখতে পাবে কি না। বেটা দশটা পাঁচটা ভরে তো শুধু সরকারের অডিট এ্যাকাউন্টস করেন আর এই সোজা হিসেবটা বোঝাতে পারবেন না?

মাফিজ : ঠিক। এবার বুঝি বাছাধন কেবল সর্ষে ফুল দেখছেন? আমাদের তো দেখছি সারক্ষণ দিব্যে পুরুষ্টু ড্যামগ্ল্যাড ভাব। সারাদিন ঘোষণা করে বেড়ান উনি নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কের কৃতি ছাত্র ছিলেন। উপদেশ দিয়ে বেড়ান হিসেবের কড়িব মার নেই, হিসেব করে চলতে জানলে কাউকেই পস্তাতে হয় না। আহাহা, কী আমার হিসেব করনেওয়ালা রে!

হাবিব : একেবারে থিতিয়ে গেলেন যে! বলুন শিগগির, আমি অফিসে যাবার আগে একবারও কলতলায় পৌঁছুতে পারব কি না। দুনিয়াছাড়া এই অঙ্কের ইয়ের্কি-ফাজলেমার খবর অঙ্ক কষতে খুব মজা লাগে না? আর আমি অতগুলো লোকের মাঝে একখানি সময়ের মধ্যে কলের পানিতে নিজের নখ ডোবাতে পারব সে অঙ্ক বুঝি কিছুতেই মাথার মধ্যে ঢোকে না?

মাফিজ : ছেড়ে দাও, বেচারা ভিরমি খেয়ে গেছে। দেখছ না কী রকম পচা মাছের মতো ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রয়েছে।

মারুফ : তুমি বুঝি আজও মুখ ধুতে পারনি!

হাবিব : ব্রাশের ওপর পেস্টের ড্যালা তুলে হাত শই করে মাজবার জন্য মাড়ি পর্যন্ত ঠেলে দাঁত উঁচিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়েছিলাম কিউতে, পাক্কা দেড় ঘন্টা।

মারুফ : তারপরও পারলে না?

হাবিব : জ্বি না। পনের জন দূরে যখন, তখন হড় হড় করে কিছু অতিরিক্ত পানি উগলে দিয়ে ভ স স্ স করে কলটা বন্ধ হয়ে গেল।

মারুফ : বন্ধ হয়ে গেল?

মফিজ : সবাই তো আপনার মতো ভোর রাতে উঠে কলতলায় বসে দাঁত মাজতে শুরু করে দিতে পারে না। আমাদের জন্য এ-রকম বন্ধ হয়ে যাবেই আচ্ছা মারুফ সাহেব, আপনার বিবি বুঝি রোজই সোবেহ সাদেকের সময় উঠে ফজরের নামাজ আদায় করেন? আপনার এই আদত সত্যি কী করে হলো, বলুন না।

মারুফ : আপনি যত সহজে বদ আদতগুলো আয়ত্ত করেছেন, আমার ভালো অভ্যেসগুলো তার চেয়ে সহজে রপ্ত হয়নি। কিন্তু চাকরটা এক্ষুণি চা নিয়ে আসবে যে। হাবিব সাহেব, বাসি মুখে চা খেতে কষ-কষ ঠেকবে না?

মফিজ : যতসব দেহাতি থিওরি। মুখ না ধুয়ে খেলে কষ-কষ, ধুয়ে খেলে ফুর-ফুরে-যতসব আজগুবি কুসংস্কার। আরে বেড টি; বেড টি করে মেরে

দাও, তা ভোর সাতটাতেই হোক কি দুপুর দশটায়। মুখ না ধুয়ে খেলেই হলো বেড টি, ঢোক ঢোক করে গিলে ফেলো। মনে হবে গরম পানি দিয়ে মুখ ধোয়া হয়ে গেল। তারপর একখিলি পান, বড় এক দলা কিমাম মিশিয়ে চিবিয়ে নাও। দাঁতগুলো একটু পেতলা রঙের হয়ে উঠবে বটে, কিন্তু মুখমণ্ডল ভরে উঠবে বিদেশী টুথপেস্টের একটা ওরিআন্টাল ঠাণ্ডা গন্ধে।

মারুফ — কিড়ে পড়া বড়শির টোপের মতো এক গাদা নোংরা জমা মুখে চা হয়তো সকলের রুচিতে সমান নাও লাগতে পারে।

মফিজ — নইলে বিছানা ছাড় সোরেহ সাদেকের সময়, এস্তেঞ্জা কর বুলুক দিয়ে, তারপর মুখে ব্রাশ পুতে মন্ত্রীর পেয়ারা কন্ট্রাকটারের তৈরি ভাঙ্গা কলতলায় এবাদত কর পানির ফোঁটার জন্য সারা সকাল। বাব্বা! আর দেরি করে উঠলে এন্তেজার কর কিউতে দাঁড়িয়ে, তারপর হাবিবের দশা হলে এন্তেকাল করা ছাড়া কোনো পথই থাকবে না।

মারুফ — ওর কথা ছেড়ে দিন। এখান থেকে পুকুর আর কতদূর হবে। আপনি চলুন গল্প করতে করতে আমিও এক সঙ্গে যাচ্ছি। দেরি করলে চা নিয়ে ছোকরা হয়তো এসে পড়বে।

মফিজ — বাবা অঙ্ক কষে তবে রাস্তা বাতলাচ্ছে, যাও যাও! কতদূর আর হবে? জোর আধ মাইল। এতে-যেতে ঘন্টাখানেকের বেশি সময় তো লাগতে পারে না। ইতিমধ্যে চা জুড়িয়ে যাবার অবস্থা হলে কষ্ট করে আমরাই না হয় তা গিলে রাখব।

মারুফ — দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, চলুন।

(চা নিয়ে ভৃত্যের প্রবেশ। একগ্লাস চা, একটা করে বিস্কিট পাঁচ জনের জন্য।)

মফিজ — এই যে বাবা এসে গেছে। দাও, দাও। পান এসেছে তো? বেশ বেশ। আহা, একি আপনারা এখনও রওনা হননি? যান যান খামকা দেরি করছেন কেন?

মারুফ — আপনার আর অত দরদ দেখিয়ে তাড়া না দিলেও চলবে। প্রয়োজনমতো আমরা নিজেরাই চলাফেরা করতে পারব। আপনার আর লেজ মুড়ে হেঁট হেঁট করতে হবে না। কি বলেন হাবিব সাহেব, ধোবেন মুখ?

হাবিব — দেখুন, মানে, আমি মফিজের মতো নোংরা স্বভাবের লোক মোটেই নই। তবে কি না ভোর থেকে একটানা এতক্ষণ উত্তেজিত ছিলাম যে মুখে ঠিক বাসি লালা জমে আছে বলে একদম মনে হচ্ছে না।

মারুফ — হ্যাঁ উত্তেজনায় লালাক্ষরণ একটু বেশিই হয়।

মফিজ — এটা একটা বিজ্ঞানের সত্য না?

হাবিব — মুখটা এখন এত তাজা আর হাল্কা ঠেকছে যেন-

মফিজ : যেন মনে হচ্ছে না যে তুমি ঘুম থেকে উঠেছ। মানে গত রাতে তুমি যে ঘুমিয়েছ তার অবসাদ মাড়ির গোড়ায় গোড়ায় ঘন লালায় জমাট বেধে নেই, সব ধুয়ে হাল্কা হয়ে গেছে।

হাবিব : অনেকটা, হ্যাঁ হ্যাঁ-আ হ্যাঁ হ্যাঁ-অনেকটা সেই রকম।

মারুফ : বুঝেছি। ধরো তোমার চা। হাঁ করে দেখছিস কী। তফাজ্জল সাহেব আর কামাল সাহেব বাইরে গেছেন। ওদের দু'পেয়ালা চৌকির ওপর রেখে তুই তোর কাজে যা।

(তিন জনে মৌজ করে চায়ে চুমুক দিতে থাকে।)

মারুফ : (অনেক আশা ও উৎসাহ নিয়ে। অন্য দুজন আগের মতোই থমথমে।) বুঝলেন হাবিব সাহেব, কাল রাতে হিসেব করে দেখেছি যে,...

(মফিজের চোখ-মুখের ভাব দেখে আর এগুতে সাহস করে না।)

মফিজ : ও-কী থামলেন কেন ? বলুন, হিসেব করে আপনি...

হাবিব : আপনি, আপনি আবার একটা হিসেব করেছেন ?

মফিজ : তাতে তুমি অতো ক্ষেপে উঠলে কেন ? ও হিসেব করলে তোমার পিত্তি জ্বলে ওঠে কেন ?

হাবিব : না ক্ষেপবে না! আজকে শুধু আমি আর ওর রুমমেটটাই ক্ষেপে উঠেছি। তাও তো কামাল এখনো শান্ত। একদিন সমস্ত ব্যারাকসুদ্ধ লোক যদি ক্ষেপে উঠে ওকে কতল করে না ফেলেছে তবে এই আমি কসম কাটলাম, গুড়ের চা নয়, মেড়ো বড় সাহেবের পেচ্ছাব খাচ্ছি, পেচ্ছাব খাচ্ছি

মারুফ : ছি ছি। কী যা তা বকছ। থাক্ আমি আর তোমাদের কাছে কোনো কথাই বলব না।

হাবিব : ক্ষেপব না! ভোরবেলায় মুখ ধুতে পারি না কন্ট্রাকটরের নাফরমানির জন্য। বেটাকে জেলে পুরতে পারছি না মন্ত্রী শালার সঙ্গে ওর টাকার সম্বন্ধ বলে; যা বেতন পাই তাতে বৌকে মেরে ফেলতে হবে গলা টিপে, বিষ কেনার বাড়তি পয়সা নেই বলে; পাকিস্তানের জন্য আত্মত্যাগ করতে পারব না দেহ ত্যাগ করতে হবে বলে— আর আমি ক্ষেপব না ?

মারুফ : এ কিন্তু বড় অন্যায়। হঠাৎ আমার ওপর এত খাপ্পা হয়ে ওঠার কোনো মানে হয় না।

হাবিব : না না। আপনাকে তো তোয়াজ করব! প্রতি লহমায় আমরা সব দুশ্চিন্তায় আর দুর্ভাবনায় পুড়ে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছি আর উনি রোজ শুয়ে শুয়ে কেবল হিসেব করেন। হ খুব অঙ্কের বড়াই। বি.এ-তে অঙ্কে ফার্স্ট হয়েছিলেন! তাই বলে আপনি আমাদের চোখের সামনে বসে হিসেব করে আবিষ্কার করবেন যে, আপনি সুখে আছেন ? আর সত্যি সত্যি সেই হিসাবের অঙ্কে বিশ্বাস করে, চোখ মুখ গাল খুশিতে চকচকে তেল-তেলে করে আপনি আমাদের চোখের সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াবেন ? আমরা না

হয় সহ্য করলাম। কিন্তু একদিন যদি এই ব্যারাক শুদ্ধ লোক ক্ষেপে যায়, দেখবেন শকুনের মতো ডানা ঝাপটে পড়ে আপনার হাসিভরা মুখটাকে ঠুকরে খুবলে নাই করে দেবে।

(এমন সময় বাইরের কাঠের বারান্দা দিয়ে বোধহয় দু'জন বেশ মোটা লোক খুব ভারি ভারি পা ফেলে দুদ্দাড় শব্দে ছুটে চলে গেল। দোতালার ঘরের কাঠের পাটাতনও সেই ঝাঁকুনিতে থরথর করে কেঁপে ওঠে। চায়ের পেয়ালা দুটো উল্টে পড়বার উপক্রম হয়। বাঁচাবার চেষ্টায় তিনজনই ঝাঁপিয়ে পড়ে কিন্তু রক্ষা করতে পারে না।)

মফিজ : গেল গেল গেল উল্টে। ঘরের পাটাতন নয়তো শালা হারমোনিয়মেব রীড বানিয়ে রেখেছে। দোতলার বারান্দায় এক ফালি করে তক্তায় পা পড়ছে আর ঘরের মধ্যেও অমনি অন্য প্রান্ত তড়াক তড়াক কবে লাফিয়ে উঠছে সারি সারি।

(কাঠের মেঝের ওপর, যেখানে চায়েব পেয়ালা উল্টে পড়েছে সেখানে, মারুফ আর হাবিব উপুড় হয়ে পড়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কিছু দেখছে।)

কী ? কাঠের ফাঁক দিয়ে চা চুঁইয়ে চুঁইয়ে নিচতলাব ঘবে পড়তে শুরু করেছে ?

হাবিব : (চাপা গলায়) হুঁ। ফোঁটা ফোঁটা করে নয়, একেবারে ঝরঝব কবে।

(নিচতলা থেকে একটা ক্ষুদে হট্টগোল শোনা যাবে। কিছু লোকের ব্যস্ত নড়াচড়া, কিছু ক্রুদ্ধ অস্ফুট উক্তি।)

মোটাগলা : (নেপথ্যে নিচ থেকে জোরে) বলি ওপরের তালার সাহেবরা, আমবা কি একেবারে আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেনে শুয়েছিলাম না কি ?

মিহিগলা : (নিচ থেকে) একেবারে বিছানার নিচ থেকে নর্দমা তৈরি কবে মাল ঢালছেন মনে হচ্ছে।

মারুফ : দেখুন দোষটা আমাদের পুরোপুরি না হলেও মাফ চাইছি। কিন্তু বুঝলেন আমাদের ওপরের তালার মেঝের তক্তাগুলো, সোজা হিসেবেই, প্রত্যেকটা ছ ইঞ্চি চওড়া। বসানো হয়েছে আধ ইঞ্চি দূরে দূরে। বুঝলেন এতগুলো ফুটো, একটু হিসেব করে দেখলেই বুঝতে পারবেন...

মোটাগলা : এ্যাঁ এ্যাঁ এ্যাঁ ?

হাবিব : নিকুচি করি তোমার হিসেবের। তুমি মুখ বন্ধ কর। (পাটাতনের ফাঁকে মুখ রেখে) শুনছেন নিচুতলার সাহেব ?

মিহিগলা : শুনব না কেন ? কানের ছেঁদায় জ্বলন্ত সিগারেটের বোটা তো ফেলেছিলেন গতকাল, তা আজ শুনতে পাব না কেন ?

মফিজ : (চাপা গলায়) আর সিকিটা-দুয়ানিটা পড়লে বুঝি টেরও পাননি! তখন তো ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া পাওয়া যায় না।

হাবিব : দেখুন, বোধহয় গ্লাস উল্টে কিছু পানি গড়িয়ে পড়ে থাকবে। আমরা সত্যি তার জন্য লজ্জিত!

মোটাগলা : পানি ? শুধু পানি ? তাহলে ধোঁয়া উঠছে কেন ?

হাবিব : মানে মানে গরম, মানে এই সেদ্ধ পানি ছিল। খারাপ কিচ্ছু নয়, সত্যি পাকসাফ পানি!

মিহিগলা : তা বাবা অত আঁঠা-আঁঠা ঠেকছে কেন ?

হাবিব : হেঁ হেঁ। ও কিছু নয় একটু তলানীর গুড় হবে হয়তো। খারাপ কিছু নয়।

মোটাগলা : গুড়! কী বলছেন সাহেব ? শেষে কি আমাদের পিঁপড়ে দিয়ে খাওয়াতে চান নাকি ?

হাবিব : চায়ের গ্লাস উল্টে গিয়ে কুকাণ্ডটা ঘটেছে। তা মিলেমিশে আমাদের থাকতেই হবে। কথা বাড়ানো মানে সকলের শান্তি নষ্ট। কিছুক্ষণ পর যখন আপনারা উনুন ধরাবেন তখন এখানে আমরা চোখ মেলতে পারব না। চোখ পোড়ানির ওপর ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় এ ঘর তখন হয়ে উঠবে শীতের লন্ডন শহর।

মফিজ : ব্যস ব্যস। অনেক হয়েছে। এবার উঠে বসো। হাতের চাটা শেষ কর।

(তিনজনে আবার আসরে বসে। নিচ থেকে শেষবারের মতো মিহিগলা ভেসে আসে— "আল্লার আকাশের ধোঁয়া মাঝ পথে আপনারা আটকে রাখলে আমরা কী করব ?" নীরবতা। গভীর তন্ময়তার সঙ্গে ভাবছে মারুফ। অন্যমনস্ক হয়ে আবার জের টেনে আনে-তার না-বলা কথাটাকে।)

মারুফ : বুঝলে, আমি হিসেব করে দেখেছি, বাড়ি যেতে পারব। পয়সায় কুলোবে।

মফিজ : (ব্যঙ্গ) সত্যি ? অঙ্কে ভুল হয়নি তো ?

মারুফ : (সরল ও উদ্ভাসিত) উহুম। শুধু ধীরে ধৈর্য ধরে এগুতে হবে।

হাবিব : (মরিয়া এবং বিস্মিত) বাড়ি যাবার টাকা তুমি হিসেব করে বার করে ফেলেছ ?

মারুফ : (দুলে দুলে গুনগুনিয়ে) হুঁ। স-ব মিলে গেছে। বুঝলে , আমি হিসেব করে দেখলাম, প্রায় দশ টাকার মতো আমি প্রত্যেক মাসেই জমাতে পারি।

হাবিব : কোন্ কোন্ খাতে কমালে ?

মারুফ : বাসে চড়ব না। ধোপায় দু'বার কম দেব। চুল ছাঁটব না।

মফিজ : তারপর ?

মারুফ : তিন মাস পরে সেটা জমে হবে ত্রিশ টাকা।

মফিজ : সে তো তোমার পথ-খরচাতেই লাগবে।

হাবিব : বৌর জন্য একজোড়া শাড়ি। বড় ছেলেটার জন্য জামা, ছোট মেয়েটার জন্য একটা কিনতে হলেও তোমার আরও পঞ্চাশটা টাকা চাই।

মারুফ : ঠিক আমারও তাই হিসাব। আট মাসে হবে আশি টাকা। আমি তখন বাড়ি যাব।

হাফিজ
মফিজ } (এক সঙ্গে ! ব্যঙ্গ!) ওহ্ তাই। ঠিকই তো।

মারুফ : ঠাট্টা নয়। আমি খুব হিসেব করেই কথা বলেছি। আমার ছ'মাস বাকি আছে।

হাবিব : (ক্ষিপ্ত) মানে ?

মারুফ : দশ টাকা হিসাবে এ মাস নিয়ে আমার বিশ টাকা জমা হলো।

(কল্পনায় বিভোর হয়ে হাসতে থাকে।)

হাবিব : শালাকে খুন করব আমি।

মফিজ : দাঁড়াও কামাল আসুক। ওকে শোনালে একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়বেই।

হাবিব : (বিড়বিড় করে) ওকে নিচতলায় শুইয়ে ওপর তলা থেকে, গরম চায়ের গ্লাস একটার পর একটা ওল্টাতে থাকব।

(খোঁড়াতে খোঁড়াতে তোফাজ্জলের প্রবেশ)

তোফাজ্জল : কার চা, আমারটাই বুঝি উল্টে একাকার করেছ ?

মারুফ : (বই ঘাঁটছে। অন্যমনস্ক। আত্মতৃপ্ত। মৃদু মৃদু হাসি।) হুঁম।

হাবিব : তোমার পায়ে কি হলো আবার। বেরিয়েছিলে তো পায়খানা যাবার কাফেলায়, দুর্ঘটনা ঘটল কখন ?

তোফা : বলো না আর। ভাবলাম এত দূর যখন এসেছি একবার সতেরো নম্বর ব্লকে ঢুঁ মেরে যাই। দু'সিঁড়ি না উঠতেই মড়মড় করে ভেঙ্গে পড়ল গোটা কাঠামোটাই। পড়ে পাটা মচকে গেছে।

মফিজ : ও, তাহলে বেশি লাগেনি হয়তো।

হাবিব : ওভারসিয়ার বাবুর নাগাল পেলে না ?

তোফা : ও বেচারাকে গাল দিয়ে লাভ নেই। সতেরো নম্বর ব্লকের অনেক আগেই তিনি আটকে রয়েছেন চিরতরে। এদিকে আসবার ওর ফুরসত কোথায় ? রোজই এ-রকম দু'চারটা সিঁড়ি, পার্টিশন, দরজা ভেঙ্গে পড়ছে। গোটা নির্মাণ প্রকৌশলটাই বড় সূক্ষ্ম। তাকে জিইয়ে জিইয়ে রাখা কি কম হেকমতের কাজ।

(এই নৈমিত্তিক প্রসঙ্গে আলোচনার শেষাংশ শ্রোতারা উৎসাহ দেখালো না। চরম ক্লান্তি ও বিরক্তি তোফাজ্জলের মুখেও। বিদ্বেষ ও হতাশার প্রতীক হাবিব ও মফিজের দিক থেকে সরে চোখ মারুফের হাস্যোদ্দীপ্ত মুখের ওপর পড়তেই তোফাজ্জলও ভ্রূ কুঞ্চিত করে। পলকে সবটা বুঝে নেয়। অন্য দু'জনের মতো তার মুখও কালো হয়ে ওঠে। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে, বদনা হাতে, নাক চেপে ধরে জ্বলন্ত আগুনের

হল্‌কার মতো লক লক করে ঘরে ঢোকে কামাল। হাত সরতেই দেখা যাবে, নাকের ও চোখের আশেপাশে অনেকখানি জায়গা টোবলা দিয়ে ফুলে উঠেছে। কৌতূহলে জীবন্ত হয়ে ওঠে তিনটি মৃত প্রাণ।)

কামাল : কোথায় সেই অঙ্কবাগীশ ? আমি একবার তাকে দেখতে চাই। এই যে, পেয়েছি তোমাকে। আর মনে থাকে যেন, এখনও তুমি মনে মনে হাসছিলে। নিজের অঙ্ক নিজেই হেসে হেসেই খুব মাৎ করে দিচ্ছ, না ? ভাঁওতা চলবে না আমার কাছে। যদি মেলাতে না পার তবে তোমার অঙ্কের ছোট বড় একক-গুণিতক সব থেঁতলে একাকার করে দেব।

তোফা : হাস, আরো হাস।

হাবিব : ধর এই খাতা। খুব বড় অঙ্ক কি কামাল ভাই ?

মফিজ : এই নাও কলম, কালি পুরোই আছে।

মারুফ : (কাঁদো কাঁদো) তোমবা আমাকে পাগল বানিয়ে দিতে চাও ?

কামাল : শুধু নিজেব হিসেব চুপিসারে সেরে পালাতে পারবে না। তোমায় দিয়ে আমাদের অঙ্কও কিছু করিয়ে নিতে চাই। বুঝলে ? লেখ।

মারুফ : তোমরা আমায়, বুঝেছি, তোমরা আমায়-

হাফিজ, হাবিব, তোফা : (তিনজন এক সঙ্গে) কিছু বোঝনি। বাছাধন, লেখ বলছি

কামাল : এই দেখ, ইচ্ছে হলে স্কেল দিয়ে মেপে দেখতে পাব। আমার মুখের প্রায় তিন বর্গ ইঞ্চি জুড়ে ফুলে উঠেছে। দু এক সেন্টিমিটারের চেয়ে বেশি নিশ্চয়ই উঁচু হয়েছে। লাল রং ওখানে নীল ও কালো হয়ে গেছে। কারণ ঘুষি, আমি ঘুষি খেয়েছি। বলতে পার সে ঘুষির বেগ মিনিটে কত মাইল করে ছিল ?

মারুফ : তুমি আমায় মারবে কামাল ? আমি তো কোনো অন্যায় করিনি। ওরা তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছে। আমি একবারও হাসিনি। হাসাহাসি করিনি। সত্যি বলছি বিশ্বেস কর।

হাবিব : বাজে না বকে হিসেব শেষ কর।

কামাল : হ্যাঁ, তার আগে আবো একটা হিসেব আছে। লেখ। লেখ বলছি। পায়খানার দরজা প্রথম মাসেই বহুল পরিমাণে ভেঙে পড়ে। এখন প্রতি দুটো খোপের জন্য মাত্র একটি করে দরজা অবশিষ্ট আছে। সে দরজা টানলে এদিকেও আসে, ওদিকেও যায়। নব্বুই ডিগ্রিতে খোলা থাকলে দুটো খুপরিই থাকবে উন্মুক্ত। অন্য যে-কোনো ডিগ্রিতেই লজ্জা নিবারণে তারতম্য দেখা দিতে বাধ্য।

মারুফ : কিন্তু এর মধ্যে অঙ্ক ঠিক কোন্ জায়গায় আছে তা তো আমি ঠাহর করতে পারছি না।

মফিজ : বুদ্ধি একেবারে চনমন করে উঠল যে। সবুর, অঙ্ক আসছে।

হাবিব : বল কামাল ভাই, তোমার অঙ্ক চলুক। ওকে আমরা ঠেসে ধরে রাখছি।

মারুফ : (চিৎকার করে) বুঝেছি, বুঝেছি। ঐযে তোমরা বলাবলি করছিলে আমাকে কতল করবে, এ বুঝি তাই। বুঝেছি। না না না।

কামাল : খামোশ! অঙ্কটা হচ্ছে : দেড়শ লোক খুপরিগুলো এক ঘন্টার মধ্যে ব্যবহার কবতে চাইলে, কত ডিগ্রি কোণ করে কখন তা খুলবে ? খোলার গতি ও কৌণিক অবস্থানের আনুপাতিক সম্পর্ক কী হবে ? যাতে কবে বিনাদোষে আমার নাকের ওপর, অত্যন্ত বেকায়দায় বসে থাকা অবস্থায়, হঠাৎ এক পশলা ঘুষি এসে না পড়ে।

(ডাক পিওনের প্রবেশ)

পিওন : খৎ হায় সাহাব।

(ছিটকে পাঁচজনই দরজার কাছে এগিয়ে যায়।)

পিওন : একই খৎ হায়। মারুফ হোসেন সাহাব কা।

মারুফ : ওঃ, আমার চিঠি দাও দাও।

(চিঠি ছিঁড়ে পড়তে শুরু কবে। জ্বলজ্বলে হাসিভরা মুখ নিযে। সঙ্গিরা দাঁত চেপে হাসি নিরীক্ষণ কবে। হঠাৎ মারুফের চেহারা পাল্টে যায় এবং সে প্রায় ভেউ ভেউ কবে কেঁদে ওঠে।)

মারুফ : ও হো হো, আমার স-ব ভুল হযে গেছে, আমি স-ব ভুলে গিযেছিলাম। ও হো হো, কী ভুলই না কবেছি।

সকলে : এ্যাঁ ?

কী বলছে ও ? কী ব্যাপার ?

কাঁদছে না কি ?

কী ভুলে গেল ?

মারুফ ভুল করেছে ?

মারফ : আমার স-ব ভুল হয়েছে, গোটা হিসেবটাই ভুল হয়েছে।

সকলে : ছি ছি কাঁদছ কেন ?

ভুল তো অমন সকলেরই হয।

কার চিঠি ওটা ?

মারুফ : কাবিনামার শর্তই আমি ভুলে গিয়েছিলাম। বৌ মনে করিয়ে দিল যে, কাবিননামায় নাকি শর্ত দেয়া হয়েছিল যে, ছ মাসে একবার বিবির মুখ দর্শন না করলে পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে আমায় তালাক মঞ্জুর করতে হবে। আমি অত টাকা কোথায় পাব ? আমার যে আশি টাকা জমাতে আট মাস কেটে যাবে। ও হো হো-স-ব যে হিসেবে ভুল হয়ে

গেল। ও হো হো।

(মারুফের উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদ মূর্তি। বাকি চারজন ফ্যাল ফ্যাল করে বোকার মতো সেদিকে তাকিয়ে থাকে।)

[যবনিকা]

ফিট কলাম

চরিত্র

সুটটাই-পরা ভদ্রলোক
ফিরোজ
লতিফ
রিক্‌শাওয়ালা
দোকানী
রসিক
মুছল্লী
ফক্কড়
পাণ্ডা
চশমাধারি
অভিনেতা
বোরখা-পরিহিতা

[কাল : ১৯৪৮ ইং]

স্থান : আদিম ঢাকা যেখানে নয়া শহরের সঙ্গে গলাগলি করে পড়ে আছে সেই রমনা-দেওয়ানবাজারের সংযোগস্থল। তেমাথার এক মুখে পুরাতন বেতার ভবন, অন্য দিকে বিশ্ববিদ্যালয়, তার উল্টো দিকে যাদুঘর।

দৃশ্য : মঞ্চের পেছনের দিকে কাঠের ফ্রেমে টিন গেঁথে দাঁড় করানো একটা উঁচু বড় পানবিড়ির দোকান। দোকানি বিড়ি তৈরি করছে। একজন চশমাধারি সিগ্‌রেট কিনছে। দোকানের সামনে একটা রিক্‌শা দাঁড় কবানো, হয়তো সওয়ারিও দোকান থেকে কিছু নেবে ঠিক করেছিল।

পর্দা উঠবে একটা ভয়ংকর রকম উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে। রিক্‌শার সুটটাই পবা ভদ্রলোক লাফিয়ে পড়ে লুঙ্গি-গেঞ্জি পরা এক লোককে আক্রমণ কবেছে। রিক্‌শাব ওপর আগাগোড়া বোরখায় মুড়ি দেয়া একটি মানুষমূর্তি-পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে বসে আছে।)

সুইটাই : বদমাশ! খুন করে ফেলব তোমাকে!

বিকশাওয়ালা: (সাহেবের মুষ্টিবদ্ধ উদ্যত হাত ধরে ফেলে) আরে আরে সাব করেন কী, করেন কী ? মানুডারে একদম গাইলা ফালাইবেন না কি !

ধবাশায়ী : ফিরোজ মিয়া, ফিরোজ মিয়া!

(এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ফিরোজ মিয়া নামে যে লিকলিকে লোকটা এগিয়ে এলো, তার গায়ে ফিনফিনে পাঞ্জাবি, বুকে বাহুতে কাঁধে চিকনেব কাজ করা। পায়ে বার্ণিশের লাল পাম্প-সু, পরনে জমকালো বোম্বাই লুঙ্গি। নাকের নিচে ক্ষুদে অথচ গোদা গোঁফ; দু'ধাব মোমে মাজা, ছুঁচোলো এবং ফলা ওঁচানো। অনবরত হাত-পা ছোঁড়ে এবং হাত-পা গোটায়, পানির ভেতর চিংড়ি মাছের মতো। তিড়িং বিড়িং চলন-বলন। কথা শেষ না করেই একটু পেছনে সরে একটা ঘুরপাক দিয়ে আসে, এসেই আবার একটুখানি তেড়ে হম্বিতম্বি করে, করেই থেমে যায়। অঙ্গভঙ্গি করে, মুখ বানায, উপড়ে ফেলার ভাব নিয়ে গোঁফের ফলায় টান দেয়।)

ফিরোজ : (রিকশাওয়ালাকে) ব্যাটা এ কি গোলাপের বটু পেয়েছিস নাকি! কবজি ভালো করে ঠেসে ধর্। আরে ঘুষিটা ছুটে বেরিয়ে গেল যে! (সাহেবকে) বলি সাহেব, এটা কী, এটা কী হচ্ছে ? সদর রাস্তায় পড়ে এসব লপ্‌টা-লপ্‌টি কীসের ? কুস্তি লড়ছেন না কি ? রাস্তাটাকে কি আখড়া পেয়েছেন ? (ধরাশায়ীকে) আরে, এ যে দেখছি লতিফ মিয়া! ঝটপট উঠে পড়ছ না

কেন ? কোলা ব্যাঙের মতো হাত-পা ছড়িয়ে সদর রাস্তায় চিৎপাৎ হয়ে পড়ে রয়েছ যে, ব্যাপার কী ? দিনে-দুপুরে আসমানের তারা পহরা দিচ্ছিলে না কি ?

(এলোমেলো হাত পা ছুঁড়ে ফিরোজ মিয়া ধরাশায়ী লতিফ মিয়াকে সাহেবের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে।)

সুটটাই : এক ঘুষিতে তোমার চোখে আমি সর্ষেফুল ঝরিয়ে দেব। বদমায়েশির জায়গা পেলে না আর!

রিক্‌শাওয়ালা: (নেমে পড়ে দু'হাত দিয়ে বাধা দেয়) যা মারছেন, হেই বহুত হইছে। মানুডারে একদম ফাক্‌কি কইরা ফালাইবেন নাকি ?

(পানওয়ালার ভালো স্বাস্থ্য, রসিক লোক। খালি গা, নাভির নিচে লুঙ্গির গেরো। অভাবনীয় ঘটনার সমষ্টি নিয়েই যে স্বাভাবিক দুনিয়া, এই উপলব্ধিতে তার সমস্ত চোখ-মুখ ঝকমক করছে। দোকানের ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে মন্তব্য করে।)

দোকানী : হালায় একদম বাইলা মাছ বইনা গেছে অখন। ওয়াখত জানস না, মওকা বুঝস না, হামলা করস ক্যান। মর্ অখন!

(খুব নিরীহ পণ্ডিত গোছের চশমাপরা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছাত্রটি এক গাদা মোটা মোটা বই চেপে ধরে অন্য হাতে আগুনের দড়ি থেকে সিগারেট ধরাচ্ছিল সে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসেছে।)

সুটটাই : (এখন লতিফ মিয়াকেই) হারামজাদকির জায়গা পাওনা আর! বোরখাপরা আওরতের মুখের সামনে বিড়ি উঁচিয়ে তুমি আমার কাছে আগুনের খোঁজ করছিলে, না ?

ফিরোজ : আওরত ? আওরত!

লতিফ : (কোনোক্রমে আক্রমণকারীর আওতার বাইরে হেঁটে গিয়ে মাথা পিঠ লুঙ্গি ঝাড়তে থাকে।) কাজটা খুব ভালো হলো না সাহেব। আখেরে অনেক পস্তাতে হবে সাহেব, এই বলে দিলাম।

দোকানী : হালায় দেখি আবার বুলিও কপচায়। খিচ্‌ক যা, খিচ্‌ক যা! সময় থাকতে থাকতে কাইটা পড় হালায়!

ফিরোজ : আওরত! আগুনের জন্য আওরতের কাছে যাবে কেন ? আপনাকে এখনও হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি বাড়াবাড়ি করবেন না। আপনি জানেন আমি কে ?

সুটটাই : (দাঁতে দাঁত চেপে মারাত্মক ভঙ্গিতে এগিয়ে আসতে আসতে) ওটার স্যাংগাত বুঝি ? আরেকটু কাছে এগিয়ে এসো তো বাছাধন, এতদূর থেকে ভালো করে চিনতে পারছি না তোমাকে।

ফিরোজ : (চিৎকার করে) ভালো হবে না, ভালো হবে না বলছি সাহেব। পুলিশ! পুলিশ! পুলিশ! (পকেট হাতড়ায়) শালার গাঁঠকাটা হুইসিলটা আবার খসাল কখন ?

দোকানী : এই চিজ আবার ফোঁপরদালালি করে ক্যান ? তুমি কেউগা ? মাঝখান থাইকা তুমি আবার পাঁচাল শুরু করলা ক্যান ?

সুটটাই : পুলিশ! পুলিশ তো আমিও খুঁজছি। ইতিমধ্যে তোমার নাকের ছেঁদা দুটো যদি আমি ঘুষিতে চিরকালের জন্য বন্ধ করে দি ? শুধু মুখ দিয়ে শোঁয়াস টেনে টেনে হুইসিল ফুঁকতে পারবে না ? ধাপ্পাবাজির আর লোক পেলে না! আমার সামনে পুলিশের লোক সেজে ধোঁকা দিতে চাও!

দোকানি : (ফিরোজ মিয়ার উদ্দেশ্যে) পুলিশের ভাটকী ? সাবাস মিয়া, একটা জব্বর বুদ্ধি ঠাওরাইছ!

(শান্ত গম্ভীর মুখে ছাত্রটি অনেকক্ষণ ধরে বোরখাধারিকে বেশ খুঁটিয়ে দেখছিল। সুটটাই পরা ভদ্রলোককেও। ওদিকে রিক্‌শাওয়ালার সঙ্গে ততক্ষণে আরও একজন মুছুল্লী গোছের টুপিপরা পথচারী যোগ দিয়েছেন। সাহেবকে তারা প্রাণপণে সামলাতে চেষ্টা করছেন আর সাহেব কোনো বাধাই মানতে চাইছেন না।)

মুছুল্লী : আরে ব্যাপারটা কী হয়েছে ? আপনি অত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন কেন ? একটু শান্ত হয়ে বলুন কী হয়েছে । লোক দুটো তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না!

ফিরোজ : পালাব, পালাব কেন, যুদ্ধ লেগেছে নাকি ? সরকারের নুন খাই না আমরা ?

লতিফ : (ঘাড় টিপতে টিপতে) খুব পাহলোয়ান হয়েছেন। টিট, সব টিট করে দেব আজ!

সুটটাই : চোপরাও! বদমাশ কাঁহিকা ? বিড়ি ধরাবার উছিলা করে তুমি মেয়ে মানুষের বোরখা ওল্টাতে চাও, আবার পাল্টা এখন সাধু সেজে বুলি ঝাড়ছ! হাড় কখানা আস্ত রাখতে সাধ নেই বুঝি!

(বেতার কেন্দ্রের সৌখিন অভিনেতা একজন : হাউই সার্ট, সিল্‌ক পাতলুন। ক্রেপের জুতো, চোখে শেলের ভারী বড় গগলস। বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র কয়েকজন, একজন একটু ফক্কড় গোছের, একজন রাজনৈতিক পাণ্ডা, একজন একটু কবি-কবি ভাবের, অন্যজন চালাক-চতুর রসিক তরুণ। ক্রমে ক্রমে ঘটনাস্থলে চারদিকে লোকের ভিড় বাড়ছে।)

ফক্কড় : ব্যাটা দেখছি আচ্ছা আহাম্মক! এই ভরদুপুরে সদর রাস্তায় কেউ শিকার খুঁজতে বার হয়! আওরত না মরদ তার নেই পাত্তা! কাপড়ের ফুটো দিয়ে দেখেছো তো কেবল এক জোড়া চোখ! সেই দুফালি নজরের তীরেই একেবারে দিওয়ানা বনে গিয়েছিলে না কি ইয়ার ?

রসিক : আঁখির বাণের পর এবার রুলের গুঁতো আসছে। সইতে পারবে তো বাছাধন ? মারধর করে লাভ কী সাহেব, হাজতে পাঠিয়ে দ্যান ব্যাটাদের। অমন গুণধর প্রেম-পিয়াসীদের আমরা না হয় মিছিল করে পৌঁছে দিয়ে আসব।

চশমাধারী : কে, রশীদ ভাই না!

সুটটাই : আরে, তুমি যে!

চশমাধারী : দাড়ি শেভ করে ফেলেছেন বলে অনেকক্ষণ চিনতে পারিনি। কিন্তু হাতের ঐ কবজি আর পাঞ্জা একই শহরে দুটো কোত্থেকে আসবে! এখানে দাঁড়িয়ে মিছেমিছি আর সময় নষ্ট করবেন না। লোক দুটোকে আমরা দেখছি। আপনি যান। এই রিক্‌শাওয়ালা চালাও।

মুছল্লী : হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনি বরঞ্চ চলে যান, সঙ্গে মেয়েছেলে রয়েছে। এই, তোমরা আবার সটকে পড়ো না যেন!

ফিরোজ : (লতিফকে) টুকে রাখ, নামটা টুকে রাখ। রশিদ মিয়া, আগে দাড়ি রাখত। (মুছল্লীকে) কী বললেন ? আমরা সটকে পড়ব ?

লতিফ : আমাদের কি ঠাউরেছেন ? হ্যাঁ, পালাব কেন ?

ফিরোজ : এই রিকশাওয়ালা, ভাগো মৎ। আমরা পালাব ? আমরা পালাব! পালাবার জুররৎ দেখছি আপনাদেরই বেশি। অন্তত খুব জলদি জলদি সে তাগিদ অনুভব করবেন।

মুছল্লী : কী বলছেন, আপনারা ?

দোকানী : হালারা দেখছি এক্কেবাবে ঘাউড়া পদের হারামি! জানের ডব নাই একদম' দেখছনি কি রকম ঘাড়ের রগ টান কইরা আবার পাল্টা চিখ্‌খার পাড়বার লাগছে। এত বাৎ ঝাড়নের হিম্মত হইল ক্যামনে হালাগো!

সুটটাই : (আবাব আস্তিন গুটিয়ে) তোমার দাঁতকপাটি একটু বেশি দেখা যাচ্ছে মিয়া। আরেকবার রা করেছ কি মিয়া মুখের দরজাটা একবারে থেঁতলে মিশ করে দেব।

ফিরোজ : গায়ে হাত তুলবেন না সাহেব, খবরদার! জানেন আমরা কাবা ?

সুটটাই : কে ফেরেশতা নাকি ? দেখি!

লতিফ : সব জারিজুরি এখন ছুটিয়ে দেব না।

ফক্কড় : শালাদের দেখছি বড় বুকের পাটা! দিনে দুপুরে সদর রাস্তায় বোরখার গাঁঠের দিকে নজর তাক করে থাকবে, আবার ধরা পড়লে পাল্টা হুমকিও দেবে! কোনো গভর্ণমেন্টের লোকটোক নয় তো ?

ফক্কড় : সিভিল সাপ্লায়ের মন্ত্রী-শালার আত্মীয়-ফাত্মীয় হবে হয়তো। কে জানে!

ফিরোজ : (গোঁফে হ্যাঁচকা টান দিয়ে) আমরা সিআইডি-র লোক।

লতিফ : হ্যাঁ হ্যাঁ সিআইডি-র লোক। ফিরোজ মিয়া কার্ডফার্ডগুলো একবার ফস করে এক নজর সাহেবদের দেখিয়ে নেও তো। চোখ ছানাবড়া বনে যাবে!

মুছল্লী : সিআইডি-র লোক!

অভিনেতা : এ পীক সিচুএশন। সিআইডি -র লোক। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন মৌলবি সাহেব। একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাতে সাউন্ড সিকোয়েনস্‌টা কমপ্লিট করে ফেলুন। বলে কিনা সিআইডি-র লোক!

ফক্কড় : এইটা খাসা বলেছো বাবা, সিআইডি-র লোক। তা গোয়েন্দা পুলিশের পো, বোরখার আড়ালে আবডালে ঘোরাফেরা করছিলে কীসের তল্লাশে, সেটা কি শুধু স্টেটের খাতিরে, না নিজেরও কিছু গরজ পড়েছিল ?

রসিক : বাবা রূপের আগুন বড় গণগণে। একবার ছোঁয়াচ লাগলেই পুড়ে ছাই হয়ে যেতে। তা বাবা তুমি নিজের নিরাপত্তা বিপন্ন করে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য এতো বেচাযেন হয়ে উঠেছিলে কোন আক্কেলে! ডেঁপোমির জায়গা পাও না আর, সিআইডি-র লোক! এক চড়ে মুণ্ডু খসিয়ে দেব।

পাণ্ডা : এই, এতটা টেম্পার দেখানও ঠিক নয়। তুমি কী করে জান যে ওরা সত্যি সত্যি সিআইডি-র লোক নয়। প্রমাণ পেয়েছো কোনো ?

চশমাধারী : এটা মন্দ বলেননি আপনি। দিনে দুপুরে সদর রাস্তায় মেয়েমানুষের বোরখার প্রান্ত ধরে যারা আকর্ষণ করতে চায় তারা যে রাষ্ট্রের আদত খিদমতগার নয়, এ কথা প্রমাণ করা সত্যি কঠিন।

ফক্কড় : বাবা সিআইডি-র লোক না হয় বুঝলাম। বোরখা ছাড়া বুঝি বাছাধন রাষ্ট্রেব শত্রু আর কোথাও খুঁজে পেলে না ? দেলের দুশমনের তল্লাশে আছো সে-কথা বলে ফেললেই হয় বাপু'

মুছল্লী : সিআইডি-ফিআইডি বুঝি না। কোন্ মতলবে মেয়ে মানুষের বোরখায হাত ওঠালে সেটা এখনও ভালো কবে না বলতে পারলে মেরে একেবারে বোবা বানিয়ে ছাড়ব।

ফিবোজ : আমরা সিআইডি-র লোক। আপনি কার্ড দেখতে চান ?

লতিফ : হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক তাই। না না। তা কেন হবে ? আপনাদের কার্ড দেখাতে হবে কেন ? কার্ড আমরা কাউকেই দেখাই না।

ফিবোজ : হ্যাঁ। তাইতো' সরকারের গোপন কাগজ বাস্তায় বিজ্ঞাপনের মতো সবাইকে দেখিয়ে বেড়াব না কি ? যা বলি তাই বিশ্বাস করতে হবে।

লতিফ : এই বাস্তা দিয়ে যে রাষ্ট্রের কত শত্রু সকাল-সন্ধ্যা গা-ঢাকা দিয়ে আনাগোনা করে আপনি সে খবর রাখেন ?

ফক্কড় : কিন্তু বাবা ঐ বোরখায় ঢাকা গোশ্‌তের বোঁচকাটাই যে বাষ্ট্রের শত্রু এটা তুমি খালি চোখে ঠাহর করলে কী করে ? শুঁকে শুঁকে আন্দাজ করেছ না কি ?

মুছল্লী : সিআইডি-র লোক বলেই তুমি তো আর হায়ওয়ান জানোয়ার নও। পর্দা আব্রু সব দলে মাড়িয়ে চলবে তোমরা ?

পাণ্ডা : এটা আপনি কি বলছেন মৌলবি সাহেব! রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য জান কোরবান করতে হবে। আর পর্দাপুসিদার ভাঁওতা দিয়ে দুশমনরা মজা লুটে নেবে ?

দোকানি : হায়, হায়, এইটা কী কন সাব, মাইয়া মানুষ শ্যাষে ফিট কলাম বইনা গেল ? ওস্তাদ, একটা ভালো মওকা হইচে, ফিট কলাম মাল হইলে আর এত বেচায়নী কিসের, লুইটা লও, লুইটা লও!

রসিক : এইটে বেড়ে যুক্তি হয়েছে। সদর রাস্তায় আওরতের বোরখা উন্মোচিত করে অন্তরঙ্গ হও আর ফিফথ কলাম, ফিফথ কলাম বলে চ্যাঁচাতে থাক। সরকার এসে মোবারকবাদ জানিয়ে যাবে।

মুছল্লী : বদমাশ! সিআইডি-র ভড়ং ধরে ভেবেছ রেহাই পাবে ? এখনো স্পষ্ট করে জবাব দাও আওরতের বোরখার গায়ে হাত লাগিয়েছিলে কেন ? যদি ঠিক মতো জবাব দিতে না পার এখানে জ্যান্ত পুঁতে ফেলব।

ফিরোজ : আওরত, আওরত কে ? আপনি কি টিপেটুপে দেখেছেন যে বলে ফেললেন এটা আওরত ?

লতিফ : আপনি বুঝলেন কী করে যে ওটা মেয়েমানুষ ? আমি তো সেটা যাচাই করে দেখবার জন্য মুখের কাছে চোখ এগিয়ে নিয়ে যাই।

ফিরোজ : জানেন না ঐ শালার ফিফথ কলামরা সব বহুরূপী। হাজার রকম ভ্যাংচা ধরতে জানে ?

লতিফ : কত জোয়ান মর্দ ঠোঁটে রং মেখে, কোমর দুলিয়ে, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আমাদের আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে গেছে। সে-সব খবর রাখেন আপনারা ?

(এই নতুন সন্দেহে সবাই বোরখাধারির দিকে হা করে তাকিয়ে থাকে। বিস্ময় ও সন্দেহ মিশ্রিত দৃষ্টি।)

অভিনেতা : হোয়াট এ টেনশন! কেউ শ্রীইক করছেন না কেন ! নিদেনপক্ষে বোরখাধারীর চৈতন্য লোপ!

দোকানি : হাচই তো! কেমন যেন একটু বেশি তাগড়া আর ডাগরডোগর মালুম হইতাছে।

ফক্কড় : মাইরি, আলগোছে একবার ছুঁয়ে পরখ করে নেব না কি ?

রসিক : পরোয়া কীসের ? ফিফথ কলাম সন্দেহই যখন একবার করলি তখন তাকে পুঁজি করে যত খুশি ঘাঁটাঘাটি করস না কেন, সরকারি ফতোয়া ঠিকই অনুমোদন করবে। আওরত হলে কী হবে, ফিফথ কলাম বলে যখন মনে হয়েছে তখন সরকারিভাবে সবই হালাল।

ফিরোজ : এই লতিফ, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন ? মওকা বুঝে ঢাকনাটা একবারই উল্টে দেখে নিয়ে কেটে পড়ছ না কেন ?

লতিফ : হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছি। দেখি ভিড় পাতলা করুন। আপনারা আর এর মধ্যে বেশি মাথা গলাবেন না। আমাদের দায়িত্ব আমাদের পালন করতে দিন। দেখি, দেখি, আপনার সবে সরে দাঁড়ান দেখি।

দোকানি : লালুস কী বানচোতের! কাউরে বখরা দিবার চায় না বুঝি !

সুটটাই : বোরখার উপর হাত দিয়েছ কি আমি পড়পড় করে তোমার গায়ের চামড়া উপড়ে ফেলব। গা খোলাতে চাও, এগিয়ে এসো।

মুছল্লী : কভি নেহী। নিরাপত্তার বাহানা করে আওরত বেপর্দা করতে চাও? গর্দান ছিঁড়ে ফেলব তোমার।

চশমাধারী : সিআইডি না বাটপাড় কোথাকার! মারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য এখন যতসব ভাঁওতা খুঁজছে। (মুছল্লীকে) আপনি ঐদিকে ঠিক হয়ে দাঁড়ান তো, আমি এদিকে রয়েছি। বোরখা ছুঁয়েছে কি হাড় কখানা গুঁড়ো করে ফেলবেন।

ফিরোজ : কী, এত বড় হুমকি?

লতিফ : ওস্তাদ, ঐ চশমাটাও নিশ্চয়ই ঐ দলের। চেহারাটা মনে মনে টুকে রাখছি।

ফিরোজ : (উত্তেজনার পঞ্চমে, বক্তৃতার ঢঙে) ভাইসব! রাষ্ট্র আজ এখনো শিশু—

লতিফ : শিশু কী, বল গর্ভজাত। রাষ্ট্রের শত্রু ফিফথ কলামদের পেটে ঝুলে আছে, হাত পা মুচড়ে!

ফিরোজ : থাম তুই! আহাম্মক কোথাকার! ভাইসব-

পাণ্ডা : থাম তুমি। আমি বলছি। (চশমাধারীকে) আপনি কী করে বুঝলেন যে ঐ বোরখাধারি রাষ্ট্রের দুশমন নয়, ছদ্মবেশধারী কোনো ফিফথ কলাম নয়?

ফক্কড় : সূক্ষ্ম সুড়ং দিয়ে একটু আগে চোখ দুটো দেখা যাচ্ছিল! তখন ঠারেঠুরে কোনো পরিচয় হয়ে গেছে কি না কে জানে!

রসিক : যাঃ কী ফাজলেমি করছিস! দেখছিস না ব্যাপারটা কী রকম সিরিয়াস টার্ন নিচ্ছে। হোক না মেয়েমানুষ, তবু সবটা জানতে হবে তো। যদি সত্যি সত্যি ফিফথ কলাম হয়- অন্তত সন্দেহ যখন হয়েছে তখন লুৎফ উঠিয়ে জবাই করব না কেন?

ফক্কড় : অত সব বুঝি না বাপু। কলাম তো দেখছি একটা, দিব্যি তাজা এবং পুরুষ্টু বলেই বোধ হচ্ছে। শুধু বোরখা দিয়ে ঢাকা এই যা আফসোস।

মুছল্লী : ওসব ফিট কলামী সিআইডি-ফিআইডির জারিজুরি আমার সামনে চলবে না। আমি যতক্ষণ জিন্দা এই মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছি ততক্ষণ ঐ বোরখার আব্রু নষ্ট করে এমন সাধ্য কারো নেই!

পাণ্ডা : ধর্মাবেগে আপনি বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন মৌলবি সাহেব। ভুলে যাচ্ছেন নেতার বাণী : পঞ্চম বাহিনীর হাত থেকে রাষ্ট্রকে বাঁচাবার জন্য আমাদের নির্মম হতে হবে।

ফিরোজ : (মুছল্লীকে) শরিয়তের বুলিতে আপনার চোখ ধেঁধে গেছে। আপনি বুঝতে পারছেন না মৌলবি সাহেব আপনি কাদের খপ্পরে গিয়ে পড়ছেন।

লতিফ : দেখি দেখি একটু সড়ে দাঁড়ান তো, আমি এখনই পরীক্ষা করে দেখছি, মরদ না আওরত।

সুটটাই ও মুছল্লী : (এক সঙ্গে গর্জন করে ওঠে) খবরদার!

ফিরোজ : ভইসব! পঞ্চম বাহিনীর কারসাজি এবার চোখ মেলে দেখুন। দেখুন কী কৌশলে তারা প্রয়োজন হলে শরিয়তের খোলস পরে জনতার চোখে ধুলা

দেয়।

লতিফ : এরা গুণ্ডার ওপরও টেক্কা দিতে ওস্তাদ।

ফিরোজ : চুপ কর, আহাম্মক কোথাকার! ভাইসব! আমরা সিআইডি-র লোক-জাতির মেরুদণ্ড, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রধান হাতিয়ার, আমরা গোয়েন্দা পুলিশ। দেখুন, আপনাদের চোখের সামনে, এই পঞ্চম বাহিনীর দল আমাদের পর্যন্ত কী বকম নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছে। নিজের চোখের ঠুলি খুলে ফেলুন, চিনে রাখুন এদেরকে।

লতিফ : (আরও উচ্চগ্রামে) জেনে রাখুন এদেরকে! এদের বুলি মধু মাখানো, কিন্তু এরাদায় বিষ। এদের মুখে মুখোশ, বুকে ফাঁদ পাতা। এদেব মনে বোরখা, দেহে বোরখা। এদের চিনে রাখতে হলে বোরখা খুলে ফেলতে হবে। (আরো চিৎকার করে শ্লোগানের ঢঙে বোরখা-

পাণ্ডা
ফিরোজ
লতিফ } (সবাই এক সঙ্গে) খুলে ফেলতে হবে'

(মুছল্লী, চশমাধারী ও সুটটাই পরা ভদ্রলোক এবং আরও অনেকে, বাধা দেবার জন্য রিকশার সামনে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ান। কিছুক্ষণেব জন্য মানুষের ভিড়ের আড়ালে রিক্‌শা ঢাকা পড়ে যায়।)

পাণ্ডা : (এগিয়ে এসে) বোরখার মুখটা একবার একটুখানি উল্টে সবাইকে এক নজর দেখিয়ে দিতে আপনাব এত আপত্তি কীসের!

সুটটাই : এক শ' বার আপত্তি আছে। আপনি সন্দেহ প্রকাশ করবাব কে ? আপনি কে ?

পাণ্ডা : আমি ? স্টেটের হিতাকাঙ্ক্ষি।

সুটটাই : আহাহা, কী কথা শোনালেন। কাজেই আপনার সামনে আমাব বিবি-বেটির বোরখা সব সময় উল্টে ধরে রাখতে হবে, না ?

মুছল্লী : কভি নেহী। ইজ্জত শরম আব্রু সব আপনি কিনে নিয়েছেন না কি ?

অভিনেতা : সিচুএশানটা এত ঘোরালো না করে সাহেব বোরখাটা একটু নেড়ে-চেড়ে দেখালে মহিলার অঙ্গ তো ক্ষয়ে যাচ্ছে না'

মুছল্লী : এটা ইংলিস্তান নয়, পাকিস্তান। ইসলামিক স্টেট। যার খুশি সে মুখ বুক উরু দেখাক। কিন্তু যে তা চায় না, তার ঈমান আমি শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়ে রক্ষা করব।

রসিক : এক নজর একটু দেখতে দিলে কিছু এসে যেত না। একেবারে অসূর্যস্পর্শা হয়তো নন।

দোকানি : একটু চাখবার দিলে আপনি যদি আরও বেশি বায়না ধরেন! লালুসে লালুস যদি আপনার বাইড়া যায় ?

ফক্কড় : লোকটাই বা বোরখা একটুখানি ওল্টাতে এত মারমুখো হয়ে বাধা দিচ্ছে কেন ? মেয়েটি তো দিব্যি শান্ত স্মার্ট ভঙ্গিতে সেই থেকেই বসে আছে। একটুও ঘাবড়েছে বলে মনে হয়নি।

রসিক : কে জানে হয়তো ইলোপ করে নিয়ে যাচ্ছে। পালাবার পথে এই ঝামেলা। বোরখা সরালে যদি হঠাৎ কেউ চিনে ফেলে সেই ভয়ে এত হাঁকডাক শুরু করেছে।

ফিরোজ : ভাইসব, এখনও আপনারা সময় থাকতে সংঘবদ্ধ হন। আমাদের নেতা বলেছেন- ঐক্যই আমাদের রাষ্ট্রের মূল বুনিয়াদ।

লতিফ : ইনকিলাব-

ফিরোজ : চোপরাও, আহাম্মক কোথাকার!

পাণ্ডা : আপনি তাহলে সত্যি বোরখা তুলে আমাদের পরখ করতে দেবেন না ?

সুটটাই : অসম্ভব।

মুছল্লী : কভি নেহী।

চশমাধাবী : মগের মুলুক পেয়েছেন ? গুণ্ডার খায়েশ মেটাবার জন্য ফিফথ কলামী জুজুর ভয় দেখালেই বিবির মুখের পর্দা আপনার সামনে তুলে ধরব ?

পাণ্ডা : (তারস্বরে বক্তৃতা) ব্রেদারানে ইসলাম! এই চশমাধারী লোকটাকেও আপনারা চিনে রাখুন। এর কথার ঢং হিন্দুস্তানের কুচক্রী নেতাদের মতো। এ পাকিস্তানে অবিশ্বাসী, যুক্তবঙ্গের উপাসক। আমাদের রাষ্ট্রের কল্যাণকে এ যুবক মশ্‌করা করে। এর জবাব দেবেন না আপনারা ?

ফিরোজ : জরুর, জরুর!

(বেতারকেন্দ্রের একজন মহিলা-শিল্পী অভিনেতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।)

মহিলা : ব্যাপার কী ?

অভিনেতা : পঞ্চম বাহিনীর বিচার শুরু হলো বলে। এখন এখানে আপনার না থাকাই বোধহয় ভালো।

ফিরোজ : ভাইসব, আপনারা সব খামোশ কেন ? জনসাধারণের গভর্নমেন্ট, গভর্নমেন্টের হাতিয়ার, সেই হাতিয়ারের ধার- আমরা সিআইডি-র লোক- সেই আমাদের ধার যারা ভোঁতা করে দিচ্ছে তাদের দুশ্‌মনীর সমুচিত জবাব দেবেন না আপনারা ?

লতিফ : নারায়ে তাকবীর-

পাণ্ডা : খামোশ! ব্রেদারানে ইসলাম, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার নামে আমি আহ্বান করছি আপনাদের। আওরত-মরদ, শরিয়ত-বেশরিয়ত, ইজ্জত-বেইজ্জত, আব্রু-বেআব্রুর কোনো সওয়াল এখানে পয়দা হতে পারে না। জোর কদমে এগিয়ে আসুন, সব্বাই কসম করুন, রাষ্ট্রের শত্রু নিপাত যাক-

লতিফ : বোরখা আমরা খুলে ফেলবই।

পাণ্ডা : এগিয়ে এসে সব্বাই মিলে দেখুন বোরখার অন্তরালে কী বিষধর পঞ্চম বাহিনী গা-ঢাকা দিয়ে পালাতে চাইছে। আসুন- ইনকিলাব-

দোকানি : (চিৎকার করে) ভাইসব, আমার ওউগা কথা আছে। ফিট কলাম স্টেট-উড আমি বুঝি না। আমি খালি কইবার চাই আওরতের গায়ে মরদ, সোয়ামি না হইলে, কোনো বেগানা মরদই হাত লাগাইবার পারে না।

ফিরোজ : তোমার তকবির বন্ধ কর এখন।

দোকানি : হুনেন আমার কথা মিয়ারা। যদি বোরখা তুইলা হাচই পরীক্ষা করন লাগে তবে ও-ই হেই কোণে, আর ওউগা আওরত খাড়াইয়া রইছে। হেয়ারে কন আউগাইয়া খাড়াইতে। তিনি গিয়া লাইড়-চাইড়া দেখুক হাচই বোরখা পইরা মাইয়া না পোলা। এইটুকুনই আমার কথা, রাজি আছেন হগলে!

অভিনেতা : ক্যাপিটাল। কী গভীর নাটকীয় অনুভূতি! কী অদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তি!

রসিক : ইতস্তত করছেন কেন? যান আপনি, তাড়াতাড়ি করুন। যে-কোনো রকম একটা সুরাহা তো হোক!

ফক্কড় : শুধু চোখ-মুখ দেখে ঠাহর করতে পারবেন না। সারা শরীরে নজর ডালেন যেন।

পাণ্ডা : লজ্জা কীসের? রাষ্ট্রের খেদমত করতে গেলে, পঞ্চম বাহিনীর ধ্বংস সাধনে এসব লজ্জা-সংকোচ বিসর্জন দিতে হবে বৈকি। সেখানে আমরা ধনী-নির্ধন, ছোট-বড়, মেয়ে-পুরুষ সবাই যে সমান, ঐক্যবদ্ধ। আসুন, আসুন-

লতিফ : এই, দেখি দেখি একটু সরে দাঁড়ান দেখি। এই দিক দিয়ে আসুন, এই দিকে- এ-কী এ্যাঁ!!

ফিরোজ : সোবহানাল্লাহ! এরি মধ্যে আওরত গায়েব হলো কোথায়-

(দুধারে লোকজন সরে গেলে দর্শকবৃন্দও এবার খালি রিকশাটা দেখতে পাবে। গোলমালের মধ্যে সবার অলক্ষ্যে বোরখাধারি কখন যেন নেমে সরে পড়েছে।)

সুটটাই : জোবেদা, জোবেদা কোথায় গেলে জোবেদা? (চশমাধারীকে) নেমে পড়ল কখন? কোন্ দিকে গেল? জোবেদা, জোবেদা, কোন্ দিকে, তুমি কোন্ দিকে গেলে?

(সবাই একটু হতভম্ব)

ফিরোজ : আমাদের সঙ্গে বুজরুকি না!

লতিফ : বোরখার নিচে ডানা লাগানো ছিল না কি?

দোকানি : এইটা কী কন? বোরখাপরা থাকলে কী হইব, ভিতরে একটা মানুষ আছিল। আপনারা যে এলাহী কাণ্ড শুরু করছিলেন সব দেইখা-শুইনা মাইয়াটার জান উইড়া যায় নাই? তাজ্জব হওনের কী আছে? জানের লগে

পঙ্খিও ডরের চোটে উইড়া পালাইছে। এর মধ্যে তাজ্জব হওনের কী আছে ?

সুটটাই : জোবেদা, জোবেদা! (বলতে বলতে কিছুটা ব্যস্ত উদভ্রান্তের মতো বেরিয়ে যায়। পেছনে পেছনে চশমাধারীও চলে যাবে।)

পাণ্ডা : লোকটা পালাল না তো। সব যেন কী রকম এলোমেলো হয়ে গেল!

ফিরোজ : লতিফ, তুই বাঁ দিকে যা। খুঁজে দেখ্, বোরখার বোঁচকাটা কোন্ দিকে পালাল। আমি সাহেবের পেছন নিচ্ছি। (সব্বাইকে) এখন আর গাধার কানের মতো খাড়া হয়ে থেকে ফয়দা কী ! দুশ্‌মন তো পালিয়েছে!

(লতিফ ও ফিরোজ, দু'জনের দু'দিক দিয়ে প্রস্থান।)

মুছল্লী : শালার জবর ধোঁকা দিল তো! বেইমান সিআইডি সেজে আমার চোখে ধুলো দেবে। বদমায়েশী কবে বলবে ফিট-কলামনীকে ধরেছি, আব ধরা পড়লে, সিআইডি বলে সাধু সাজবে। আবার সব শেষে হুমকি পর্যন্ত দিয়ে যায়। স্টেট-উড বুঝি না, আমি একাই তোমাদের শায়েস্তা করব।

(লতিফকে অনুসরণ কবে নিষ্ক্রান্ত)

বসিক : কী জ্ঞান আহরণ কবলে ওস্তাদ ?

ফক্কড় : আগামীকাল বিশ্ববিদ্যালয়েব করিডোবে প্রয়োগ করে দেখাব, বিশ্বাসঘাতকতা না কবলে তোকেও দলে টানতে পাবি।

বসিক : হাত মেলা।

(এক সঙ্গে দু'জন বেরিয়ে যায়)

মহিলা : বোরখার নিচে ছিল কী ? পুরুষ না মহিলা? পঞ্চম বাহিনীর একজন যে, একথা মনে জাগল কী করে ?

পাণ্ডা : সব সময়েই সতর্ক থাকতে হবে তো। শিশু রাষ্ট্র, কখন কোন্ দিক থেকে গা ঢাকা দিয়ে কে কী মতলব নিয়ে এগিয়ে আসছে, ওত পেতে বসে আছে, কে জানে! সব সময় সাবধান না থাকলে চলবে কেন! (একটু সরে গিয়ে) শালা আওরতই ছিল না ফিফথ কলামনিস্ট ?

(বিড়বিড় করতে করতে বেরিয়ে যায়)

মহিলা : মেয়েটার জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছে। আপনার ?

অভিনেতা : আপনারই হচ্ছে, আর আমার হবে না ?

মহিলা : রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিপদগ্রস্ত হচ্ছে ঐ জন্য, না মেয়েটা পালিয়ে আবার কোনো নতুন বিপদে পড়তে পারে সেই আশঙ্কায় ?

অভিনেতা : কোনোটার জন্যই নয়। আপনি বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, যে-কোনো কারণেই হোক, আপনি মনে মনে দুঃখ পাচ্ছেন-ভেবে, আমিও দুঃখিত।

মহিলা : থ্যাংকস। চলুন এখন এগোনো যাক।

অভিনেতা : আধ মিনিট। সিগরেটটা নিয়েনি। দেখি- (দোকানির কাছ থেকে সিগরেট

নিতে নিতে।) আচ্ছা ঐ লোক দুটো সত্যি সিআইডি-র লোক ছিল নাকি, না এমনি বদমাশ লোক বেকায়দায় পড়ে ভাণ করছিল?

দোকানি : ক্যাম্বায় কমু! বোরখা পড়লেই মরদ যদি আওরত হইবার পারে তবে আওরত দেখলে গুণ্ডা সিআইডি হইবার পারবো না ক্যান? রক্তের গন্ধ পাইলে বাঘ বেচায়েন হয় না? সবই এক জাতের সাব-।

(অভিনেতা ও মহিলা শিল্পীর প্রস্থান। দোকানি মহিলার নিষ্ক্রমণ এক চোখ ছোট করে রসিয়ে রসিয়ে দেখে।)

হালায় বোরখা পরাইয়া দিলে মাইয়ায় মাইয়ায়ই বা ফরাগ কী! সবই এক জাত!

[নিজের জীবনদর্শনে নিজেই উদ্ভাসিত]

[যবনিকা]

আপনি কে ?

চরিত্র

তরুণ
ব্রিগেডিয়ার
মোমেন
বাসেত
সর্দার
আগন্তুক
তন্বী
কুলসুম

[রৌদ্রালোকিত প্রখর দ্বিপ্রহর। নির্জন প্রান্তর। উন্নত প্রাচীন বটবৃক্ষ; নিম্নে বিস্তৃত ছায়া।

এক তন্বী। গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে মোটা শিকড়ের আসনে পা ছড়িয়ে বসে। হাতে একটা বই, খোলা। পাশে কয়েকটা বই, সাজানো। থম্ ধরে আছেন। নাকে চশ্‌মা, চোখে আগুন।

এক তরুণ। সাদা শার্ট-পায়জামা পরা। গলায় দুরবিন ঝোলানো। কী ভাবতে ভাবতে ঢোকে, চারদিকে চোখ ঘোরায়। আচমকা মেয়েটিকে দেখে স্তব্ধ হয়ে যায়।]

তন্বী : মনে হলো যেন একবারে আঁৎকে উঠেছেন। কী হলো ? ভূমিকম্প না বিষধর সর্প ?

তরুণ : আমি যাই।

তন্বী : কোথায় ? যে দিকে দু-চোখ যায় ? চোখের ওপর, হোক নিজের চোখ, অত আস্থা রাখা সব সময় নিরাপদ নয়। তাছাড়া, দুরবিন লাগালে যে চোখের জ্যোতি বাড়ে না, সে-কথাও বোধহয় এখন আর বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। কি বলেন ?

তরুণ : আপনি বিশ্বাস করবেন না, জানি।

তন্বী : কেউ করবে না।

তরুণ : আমি সত্যি দুঃখিত। সত্যি লজ্জিত। বিশ্বেস করুন, আমি ইচ্ছে করে এ পথে আসিনি। কোনো লক্ষ্য, কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আসিনি। আপনি যে ঠিক এই পথই বেছে নিয়েছেন এবং ঠিক এই গাছতলায় এসে পৌঁছেছেন, এ সম্পর্কে একটু আগেও আমার কোনো ধারণা ছিল না।

তন্বী : বাঃ, ভাষা পর্যন্ত অবিকল রাজনৈতিক নেতার। সংবাদপত্রে প্রেরিত বিবৃতির মতো। সত্য-মিথ্যা কিচ্ছু বুঝবার জো নেই।

তরুণ : আপনি আমার সব কথা বুঝে-শুনে গ্রহণ করেন, জানা ছিল না। তাহলে ভালো করে শুনে রাখুন। আজকের পিকনিকের নিয়ম আমি ইচ্ছে করে ভঙ্গ করিনি। যা হয়েছে এটা দৈবাৎ। অনিচ্ছাকৃত।

তন্বী : কী হয়েছে ?

তরুণ : এই-এখানে আপনার কাছে এসে পড়া।

তন্বী : তার বিরুদ্ধে সর্দারের কোনো নির্দেশ ছিল নাকি ?

তরুণ : নির্দেশ ছিল আমরা গাড়ি থেকে নেমেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ব, যার যেমন খুশি। কেউ কাউকে অনুসরণ করব না, সেধে কারো কাছে যাব না। এক মাইলের মধ্যে থাকব এবং প্রত্যেকেই কিছু না কিছু করব, যতক্ষণ না ব্রিগেডিয়ারের বিউগ্‌ল শোনা যাবে। যখন বাজবে তখন সেই শব্দ শুনে সবাই এসে ঐ জায়গায় মিলব। তারপর খাব।

তন্বী : আপনি যে এবারও ফার্স্ট ক্লাস পাবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কথা বানাতেও পারেন। কথা মনে রাখতেও জানেন- আর চাই কী ?

তরুণ : আপনি আগে থেকে একটা সিদ্ধান্ত করে বসে আছেন। কাজেই আপনাকে দিয়ে অন্য রকম কথা বিশ্বাস করানো কঠিন। কিন্তু আমি সত্যি আপনাকে আগে দেখে, তারপর এদিকে আসিনি।

তন্বী : আসলেও তা স্বীকার করার মতো সাহস বা সততা আপনার নেই।

তরুণ : আমি আসিনি।

তন্বী : মিথ্যে কথা।

তরুণ : আমি চলে যাচ্ছি।

তন্বী : তাতে বাঁচতে পারবেন না। কেউ না কেউ দেখে ফেলবেই। আপনার সহপাঠীদের মধ্যে আবো ক'জন পকেটে করে দুরবিন এনেছেন, কে জানে!

তরুণ : বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক অনেক আছেন, কিন্তু সবাই জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে মগ্ন নন। আর আপনিও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরানন্দময় আকাশে এমন কিছু অদৃষ্টপূর্ব জ্যোতিষ্ক নন, যে, সবাই দুরবিন হাতে নিয়ে হন্যে হয়ে আপনাকে খুঁজে বেড়াবে।

তন্বী : অপূর্ব। আপনি চটে গেলে আপনার ভাষাও একেবারে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে দেখছি।

তরুণ : নিভিয়ে দিলাম। চলে যাচ্ছি।

তন্বী : আমি আসতে বলিনি আপনাকে। আপনি দুরবিন লাগিয়ে খুঁজে বার করেছেন আমাকে। তারপর পরম নিশ্চিন্ত মনে পথ ভুলে এখানে এসে হাজির হয়েছেন।

তরুণ : আপনার দুঃসাহস দেখে অবাক হই।

তন্বী : আমি আপনার মতো নামজাদা ছাত্র না হতে পারি, কিন্তু ভীতু নই।

তরুণ : ভীতু ? আমি ?

তন্বী : হ্যাঁ, আপনি। সবার সামনে যখন বললাম আপনি আমার সঙ্গে চলুন-

তরুণ : কেন বললেন ?

তন্বী : কেন বলব না ? আপনি আমার চেয়ে পড়ালেখা বেশি করেছেন। আপনার সঙ্গে দু-এক ঘন্টা আলাপ-আলোচনা করায় আমার ষোল আনা স্বার্থ।

তরুণ : সবাই সকল স্বার্থ সমান বোঝে না। তাছাড়া মাঠে মাঠে ঘুরে কাজের কথা আলোচনা হয় না।

তন্বী : ইচ্ছে থাকলে সবই হয়। এলোমেলো মাঠে ছড়িয়ে. বড়শির ছিপ আর দুরবিন কাঁধে ঝুলিয়ে, বিউগল বাজিয়ে যদি পিকনিক হতে পারে, তবে তার মধ্যে কিছু কাজের কথাও হতে পারে। আমি লুকিয়ে কাজ করি না।

তরুণ : অন্যেরা অন্য রকম ভাবতে পারতো।

তন্বী : বয়ে গেল। এখন আমি অন্য রকম ভাবতে পারি না ? এই যে সবার সামনে ভাব দেখালেন আপনি আমার কথা মোটে শুনতেই পাননি—তারপর এখন, এখন এই যে কাণ্ডটা করলেন—এ নিয়ে আমি কিছু ভাবতে পারি না ?

তরুণ : কী কাণ্ড করেছি আমি ? কী ভাববেন আপনি ?

তন্বী : কেন ভাবব না ? আপনি প্রবঞ্চনা ভালোবাসেন। আপনার মধ্যে দু'রকম ভাব। লোকের সামনে একরকম, মনের মধ্যে অন্যরকম, আড়ালে আরেক রকম।

তরুণ : কী যা-তা বলছেন!

তন্বী : একশবার বলব। কেন আড়ালে গিয়ে আপনি দুরবিন লাগিয়ে আমাকে খুঁজে বার করলেন ? যখন বললাম, তখন লোকের ভয়ে সঙ্গে আসতে সাহস হলো না ? এখন যে এলেন, লজ্জা করল না। আমার কথায় মুখ ঘুরিয়ে যখন অন্যমনে অন্য দিকে চলে গেলেন, তখন আমার অপমান হয়নি ? কুলসুম আপা আঁচল চেপে হেসে ওঠেনি ? অত আপনভোলা স্কলারই যদি হবেন, তবে এখন কী করে আবার আমার আঁচলের পিছু পিছু ছুটে এলেন ?

তরুণ : আসিনি। আপনার কেন, কোনো তন্বীর আঁচলই আমার জীবনের ঝাণ্ডা নয়। আঁচলের পতাকা দেখে যারা দিকনির্ণয় করে আমি তাদের দলে নই, এ আপনি ভালো করে জানেন।

তন্বী : না জানি না। আমি যা জানি, তা অন্য রকম। সেদিন আপনি জানেন আমি সিনেমায় যাব-

তরুণ : কী করে জানি ?

তন্বী : হয়তো আমিই বলেছি। সেদিনই আপনিও দৈবাৎ সিনেমার হলে গিয়ে হাজির হন। কোনো অনুষ্ঠানে যদি আমার গান গাওয়ার কথা থাকে তবে আপনি লাইব্রেরি ছেড়ে বেখেয়ালে গিয়ে একেবারে প্রথম সারিতে আসন নেন। সবই দৈবাৎ না ? দৈবের সঙ্গে আপনার এত মিতালি কিসের ?

তরুণ : সত্যি বলছি, আপনি যে এই গাছতলায় এসে-

তন্বী : না কিচ্ছু জানতেন না। একেবারে মাসুম। দুরবিন দিয়ে বুঝি কেবল আকাশ আর গাছপালা দেখেছেন, না ? বটগাছের চূড়া দেখেই বুঝি আপনার প্রকৃতি-প্রেম চাড়া দিয়ে উঠেছে। আর সেই টানেই সব বন বাদাড় পেরিয়ে-

তরুণ : আমার ঘাট হয়েছে। আমি হার মানছি। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষুধায় খুব কাতর হয়েছেন। নইলে কখনই এ-রকম অবর্ণনীয় ভাবকে ভাষা দিতে পারতেন না। দোষ দেই না। আমার অবস্থাও তথৈবচ। আরো কঠিন বলতে পারেন। আপনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কথা বলার মতো শক্তি নেই আর।

তন্বী : চলে যান না কেন তাহলে, দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন ? একটু আগেই না একবার বিদায় নেবেন বলে হুমকি দিচ্ছিলেন। ক্ষিদেয় কি স্মৃতিভ্রম ঘটেছে নাকি ?

তরুণ : যাচ্ছি।

তন্বী : দাঁড়ান।

তরুণ : কেন ?

তন্বী : দুরবিনটা আমার কাছে রেখে যান। আপনাকে বিশ্বাস কি! আবার হয়তো ঠিক সন্ধান নিয়ে দৈবক্রমে সামনে এসে হাজির হবেন।

তরুণ : সত্যি বিষ ঢালতে জানেন। আমিও জানি। ক্ষিদের চোটে সত্যি আমার মাথার ঠিক নেই। এই ধরুন দুরবিন দেখবেন, যে ভুল আমি করেছি বলে সন্দেহ করছেন, হাতে দুরবিন পেয়ে নিজে যেন তার পুনরাবৃত্তি করবেন না।

তন্বী : কী ? কী বললেন আপনি ? পরিষ্কার করে বলেন তো আরেকবার।

তরুণ : নিশ্চয়ই বলব। আমি চলে যাচ্ছি। যতদূর পারি। খালি চোখে অন্তত যেন দেখা না যায় এতদূরে। দেখবেন, দুরবিন হাতে পেয়ে আপনি যেন ঠিক পেছন পেছন গিয়ে হাজির না হন। অন্তত বিউগল শোনার আগে তেমন দৈবযোগ না ঘটে।

তন্বী : কী! কী বললেন! আপনি নিচ! আপনি বঞ্চক।

তরুণ : আহা হা! করেন কী ? করেন কী ? ওটা ছুঁড়ে মারবেন না। দামি জিনিস। মাথা ফেটে যেতে পারে।

তন্বী : মারব। একশো বার মারব। সব ভেঙে চুরমার করে ফেলব।

(কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই ইউ.ও.টি.সি-র পোশাক পরা ব্রিগেডিয়ার নামধারী ছাত্রটি নিঃশব্দে গাছের পেছন থেকে বেরিয়ে প্রচণ্ড বেগে বিউগল ফুঁকতে থাকে। খুব গম্ভীর ভাবে। তরুণ মাটিতে বসে পড়ে। তন্বীও।)

তরুণ : আপনিও শেষে এই বটবৃক্ষতলকেই শ্রেষ্ঠ স্থান বলে নির্বাচন করলেন ? হাতে কোনো দুরবিন ছিল নাকি ?

ব্রিগেড : এ্যাঁ ? দুরবিন ? কেন আমার তো বিউগল।

তন্বী : একটা ভালো জায়গা খুঁজে বার করতে আপনার এতক্ষণ লাগল ? বেলা ক'টা বাজে খেয়াল আছে ? আপনাদের এই ভুতুড়ে পিকনিকে, শেষে কি খাওয়ার পাটটাও উঠিয়ে দেবেন স্থির করেছেন নাকি?

ব্রিগেড : অন্যের কথা জানি না। আমি তো জঙ্গলে বসে রাক্ষসের মতো খাবো বলেই পিকনিকে আসি।

তরুণ : সর্দারজী কী এনেছে রে ?

ব্রিগেড : টপ সিক্রেট। তবে ট্রেনে তামার হাঁড়িগুলোর মধ্য থেকে যে-রকম খোশবু আসছিল তাতে মনে হলো, সব রান্না করা এবং বেশ জমকালো গোছের।

তরুণ : কাবাব আর রোস্ট যে আছে, সন্দেহ নেই।

তন্বী : সঙ্গে কিছু মাটির হাঁড়িও ছিল। বোধহয় দই-সন্দেশ কিছু হবে-না ?

তরুণ : আপনার খালি চোখের নজর দেখছি বেশ তীক্ষ্ণ।

তন্বী : জ্বি।

তরুণ : আমার দুরবিনটা এবার ফিরিয়ে দেবেন ? আর সবাই আসতে এত দেরি করছে কেন, দেখি। আর সহ্য হচ্ছে না।

তন্বী : মাটিতেই পড়ে আছে। ইচ্ছে হয় তুলে নিতে পারেন।

তরুণ : ক্ষিদেয় আধা-পাগল, বিভেদের দিকে আর নজর দিতে পারছি নে, নইলে সমুচিত জবাব দিতাম।

তন্বী : তর্ক না করে একটু দেখুন-সর্দারজী খাবারের হাঁড়ি-পাতিলগুলো নিয়ে ঠিক পথে ছুটে আসছেন কি না। ব্রিগেডিয়ার,থেমে কেন। আপনি বিউগল বাজাতে থাকুন। সর্দারজী এখন পথ ভুল করলে প্রাণ রাখা কঠিন হবে।

(এরপর থেকে মাঝে মাঝেই বিউগল ধ্বনি হবে। তরুণ চোখে দুরবিন দিয়ে চার দিকে চোখ ঘোরাবে।)

তরুণ : সর্দারজীর কোনো চিহ্ন নাই। তবে আর সবাই চারদিক থেকে রণ দামামা শুনে বীর সৈনিকের মতো ছুটে আসছেন।

ব্রিগেড : আর সবাই জাহান্নামে যাক। খাবার, খাবার চাই। সদারজী কোথায়?

তন্বী : দুরবিনটা আমার হাতে দিন একটু।

তরুণ : যা আমি দেখছি না, আপনিও তা দেখতে পাবেন না।

তন্বী : সব জিনিস আপনি মন দিয়ে দেখেন বা শোনেন, এ কথা আমি বিশ্বাস কবি না।

ব্রিগেড : কিছু দেখেছেন?

তন্বী : না। অন্ধকার।

(গোবেচারা মোমেন ধীরে ধীরে ঢোকে। হাতে বড়শির ছিপ, একটা থলি ইত্যাদি। ঢুকে চুপ করে এক পাশে গিয়ে বসে।)

তরুণ : কাছেই ছিলে নাকি?

মোমেন : এইতো পুকুরপাড়ে।

তন্বী : আর কিছু জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। উত্তর জানা আছে। পুকুরে অনেক বড় বড় মাছ আছে। কয়েকটা লেগে ছুটে গিয়েছিল, শেষটা তার মধ্যে আবার ঐতিহাসিক ভাবে অতিকায় এবং কৌশলী মৎস্য ছিল, ইত্যাদি।

মোমেন : সকলের সঙ্গে মাছ ধরা নিয়ে ডিস্‌কাস্‌ করা আমি বন্ধ করে দিয়েছি। আপনাদের কি খাওয়া হয়ে গেছে?

(ঢোকে কুলসুম তারপব বাসেত তারপর আরও অনেকে।)

কুলসুম : কী, এখনো খাওয়া রেডি হয়নি? তোমাদের মতো লোকের সঙ্গে পিকনিকে আসা এক ঝকমারি। কেবল তোড়জোড় আর হাঁকডাক, আর যত উদ্ভট প্রোগ্রাম। সর্দারজী কোথায়? বিউগলের সঙ্গে সঙ্গে না খানা এসে হাজির হয়?

বাসেত : আপা একেবারে যাচ্ছেতাই। সারাক্ষণ তোমাদের মুণ্ডু চিবিয়েছে।

কুলসুম : নিরস। শুকনো। এখন খানা কোথায় বল। তোমাদের সর্দারজীর এত আড়ম্বরের জারিজুরিটা দেখাও একবার।

মোমেন : আমার কিন্তু সর্দারেব উপর পুরো ঈমান আছে। ওর প্ল্যান কখনো এদিক-ওদিক হয় না। হয়তো আরো নতুন কিছু মজা যোগ হচ্ছে, তাই এই দেরিটুকু-

তন্বী : মজা কি ভেজে খাব নাকি ?

তরুণ : যে জিনিস ভাজা হয়েছে, তার আবির্ভাব ছাড়া, অন্য কিছু আমাদের এখন কাম্য নয়। যদি তাতে বিলম্ব ঘটিয়ে অপর কোনো বস্তু এগিয়ে আসে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেব। আপাতত সেরূপ বর্বর আচরণে কোনো দ্বিধা থাকবে না। বুভুক্ষা সর্বগ্রাসী, সর্বজয়ী।

কুলসুম : বাপ্‌রে! তুমি বাপু এখনো নকশা করে কথা বলতে পার! আমার সে ক্ষমতাও লোপ পেয়েছে। ব্রিগেডিয়ার তোমার বিউগল বাজাতে থাক— বাজাতে থাক প্রাণপণে— যত জোরে পার, যতক্ষণ পার— দেখি খাবার সুদ্ধ সর্দারজী হাজির হয় কিনা ?

মোমেন : না, না, সে-কী ! উনি নিশ্চয়ই এসে গেছেন। নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে এর মধ্যে।

তন্বী : বিউগল বাজাও।

তরুণ : বাজাও। বাজাও কলজে ভরে, গলা ফুলিয়ে, গলা ফাটিয়ে। নিঃশেষে প্রাণ দান করে বিউগল বাজাও। কারণ, যদি সর্দারজী না আসে, আমাদের মরণই ভালো।

সকলে : বাজাও, বাজাও।

(বিউগল উঁচিয়ে প্রথম দু'ফুঁ খুব জোরে দিতেই পেছন থেকে ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসে সর্দারজী উপাধিধারী যুবক। ট্রাজিক নায়কের ভাব নিয়ে হাত রাখে ব্রিগেডিয়ারের কাঁধে।)

সকলে : (এলোমেলো) এ-কী! সে-কী! এ মূর্তি কেন তোমার ? খাবারের হাঁড়িগুলো কোথায় ? ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন ? প্রাণ দিয়েও ওগুলো বাঁচালেন না কেন ?

কুলসুম : আমি বিশ্বাস করি না। নিশ্চয়ই নিজে সব সাবড়ে এখন নাটক করছেন।

মোমেন : ছি ছি কুলসুম আপা। সর্দারজীকে আপনি এত নীচ ভাবছেন ?

তন্বী : আপনার ইচ্ছে হয় ওঁকে যত খুশি উঁচুতে তুলে রাখুন, বটগাছের মাথায় নিয়ে বসান, কিন্তু আমি আর সহ্য করতে রাজি নই। ভদ্রমহিলার মতো আচরণ আমার কাছ থেকে আশা করবেন না আপনারা।

তরুণ : অপরাপর ব্যক্তিবর্গকে বলছেন না ?

তন্বী : চুপ করুন আপনি। আপনার কথা স্বতন্ত্র। আপনি পিকনিকে এসেছেন দুরবিন ঘুরিয়ে দুনিয়া দেখতে। আমরা সেজন্য আসিনি।

তরুণ : সে তো ঠিকই। আদর্শগত পার্থক্য।

কুলসুম : সর্দারজী, খাবার কোথায় ?

সকলে : (গোলমাল করে) কোনো রকম বক্তৃতা ছাড়া স্পষ্ট জবাব দাও। কথার চালে আর ভুলছিনে। আজ একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে কিন্তু। ও-রকম মুখ ফ্যাকাসে করে ভাঁওতা দিতে চেষ্টা করো না। এ-রকম সর্দারী করতে গেলে দুর্ভোগ আছে তোমার।

মোমেন : তোমরা সব মারবে নাকি ওকে ?

সকলে : জবাব দাও। সঙ্গের খাবার কোথায় গেল ?

সর্দার : নেই।

সকলে : (গোলমাল করে) নেই ? নেই কি ?

তন্বী : নেই ? তা হতে পারে না। ছিল যখন, তখন নিশ্চয়ই আছে । কোথায় আছে, সে খবরটা দিন।

সর্দার : আমি সত্যি, কী বলব, জীবনে এমন-

তরুণ : এমন নির্বিবাদে, এমন সুকৌশলে, এমন অবলীলাক্রমে এতগুলো লোককে আহম্মক বানাননি, তাই না ?

কুলসুম : পিকনিকেব এ-রকম ঘোরালো প্রোগ্রাম তো সর্দারজীর মাথা থেকেই এসেছিল না।

ব্রিগেড : সর্দার এটা যদি তোমার রসিকতার নমুনা হয়, তাহলে কিন্তু এই ঠাট্টার জের টেনে, রাইফেল তুলে আমিও তোমাকে ফটাস করে মেরে ফেলতে পারি।

তন্বী : তাই করুন।

মোমেন : এ্যাঁ! সর্দারজী, ওদের কথার জবাব দিচ্ছ না কেন ?

সর্দার : জবাব দেবার কিছু নেই। তাড়াহুড়োয় ট্রেন থেকে খাবার নামানো হয়নি।

সকলে : (হট্টগোল) কী ? কী ? এখন উপায় ? তুমি লিডার, সর্দার। দায়িত্ব তোমার। যেখান থেকে পার, খাবার জোগাড় কর।

তন্বী : এখান থেকে বাজার কতদূর ?

সর্দার : চার মাইলের মতো।

কুলসুম : দু' ক্রোশ!

তন্বী : আপনি আমার সঙ্গে বাজারে যেতে রাজি আছেন ?

তরুণ : তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারবেন তো ? চলুন।

মোমেন : দেখুন। কিছু যদি মনে না করেন, তবে মানে, আমি শপথ নিয়েছিলাম, এসব নিয়ে কারো সঙ্গে কোনো রকম ডিসকাস্ করব না। তা যদি, মানে, এখন যে-রকম-

কুলসুম : মহা মুশকিল! বলতে চাও বলো, না হলে বোলো না।

মোমেন : ইয়ে মানে, আমি তো সঙ্গে করে ছিপ-বড়শি এগুলো নিয়ে এসেছিলাম-

সর্দার : তুই থাম মোমেন। আমাকে রক্ষা করতে গিয়ে আর ডোবাস নে।

তন্বী : যেমন সর্দার তেমনি স্যাঙ্গাৎ! বলিহারী কল্পনাশক্তি! আপনি টোপ ফেলবেন, মাছ সেটা গিলে ফেলবে, তারপর আপনি আবার সেটাকে টেনে ডাংগায় তুলবেন, তারপর ইত্যাদি ইত্যাদি করে আমরা সেটাকে ভোজন করব। সমস্যার একেবারে কিউইডি করে ছাড়লেন দেখছি।

মোমেন : না না। মানে আমি তা বলছিলাম না। আমি অত দূরের কথা ভাবিনি।

কুলসুম : কথা যদি অত কাছেই হবে, তবে ভাই এত এলোপাথাড়ি খাবি না খেয়ে টক করে বলে ফেল না কেন ?

মোমেন : মানে, আমি একটা মাছ ধরে ফেলেছি। রুই মাছ। বড়ো। ধরেছি। আমার এ হাতের এই ব্যাগটার মধ্যেই আছে। ওটাকে দিয়ে কিছু করা যায় না ?

(হৈ চৈ। তরুণ দুরবিন হাতে দূরে কী খোঁজে।)

ব্রিগেড : মাছ কৈ দেখি ? বাব্বা ! খাসা মাছ ধরেছিস তো !

তন্বী : বিশ্বাস করি না। নিশ্চয়ই বরফ দেয়া মাছ, কিনে এনেছে। টিপে দেখুন।

মোমেন : আমি এইজন্যই এসব কথা ডিসকাস্ করতে চাই না। মাছটা যে একটু আগেও জ্যান্ত ছিল তা ওর চোখ দেখেও বুঝতে পারছেন না ? আঁশ দেখছেন না কী-রকম চকচক করছে ?

তন্বী : নরম কেন ?

মোমেন : নতুন পানির টাটকা মাছ একটু নরমই হয়। বাসি হলে পর একটু শক্ত হয়! বরফে রাখলে আরও বেশি শক্ত হয়। যাক সে-সব কথা। আপনার সঙ্গে আমি এ নিয়ে কোনোরকম ডিসকাস্ করব না।

কুলসুম : কিন্তু শুধু মাছ। কেউ কি নেই কিছু করতে পাবে ?

বাসেত : একটু নুন মশলা তো চাই কুলসুম আপা।

ব্রিগেড : না, কিচ্ছু চাই না। তোমরা আগুন জ্বালো। আমার সঙ্গে ছুরি আছে। পুড়িয়ে খাব। যারা রাজি আছ তারা আমার সঙ্গে থাকতে পার। বাকি যারা-

অনেকে : রাজি! রাজি! কাঁচা যে খেয়ে ফেলছি না তাতেই সংযম ও সভ্যতার পরাকাষ্ঠা হচ্ছে!

তরুণ : (চোখে দুরবিন লাগানই রয়েছে) আমি রাজি নই।

তন্বী : কেন ?

তরুণ : মনে হচ্ছে আমার ভাগ্যে ভালোখাবারই জুটবে।

(সকলে চমকে উঠেছিল। এবার একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল।)

তন্বী : আপনার দুরবিন দেখছি যা চায় তাই খুঁজে পায়।

তরুণ : হয়তো। ব্রিগেডিয়ার!

ব্রিগেড : জী। কী দেখছেন ? কী হুকুম ?

কুলসুম : এ আবার কী লড়ায়ের ময়দানের হাবভাব করছো বাপু। কী দেখছ বলেই ফেল না।

তরুণ : ব্রিগেডিয়ার, নিশ্চয়ই আমরাই লক্ষ্য। যদি নাও হয়, টেনে নিয়ে এসো আমাদের দিকে। জীবনের মতো একবার তোমার বিউগলে সাইরেনের যাদু ডেকে নিয়ে এসো। বাজাও।

(ব্রিগেডিয়ার গভীর আবেগ নিয়ে বাজাতে থাকে।)

সর্দার : (উত্তেজিত) তাইতো! এ-কী ? এ লোকটা কে এদিকে আসছে ? পেছনের কুলি দুটোর মাথায় ওগুলোতে আমাদের হাঁড়ি-পাতিল। ইউরেকা! খোদা তুমি আমার মান রেখেছ।

তন্বী : (তরুণকে) আপনি আত্মভোলা স্কলার। এ-রকম খ্যাতি আপনার আছে।

তাই বলে এই রকম পরিস্থিতিতে দুরবিনটা একলা দখল করে রাখা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নয়। একটু দেবেন আমাকে ?

তরুণ : না। এ দুরবিন আপনার চক্ষের শূল, আপদের মূল, অশান্তির কাঁটা। এখন যে আবার চাইতে এসেছেন ? দেব না। তাছাড়া দুরবিনের আর কোনো দরকার নেই। খালি চোখেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যেই হন, ব্রিগেডিয়াবের বিউগল শুনে শুনে ঠিক আমাদের বরাবর চলে আসছে। পৌছে গেল বলে।

সর্দার : ঐ যে লম্বা টিফিন কেরিয়ারটা দেখা যাচ্ছে, কুলির হাতে , ওতে আছে ঢাকাই পরোটা। তিনচার কুড়ি। পেতলের হাঁড়িতে মুরগির রোস্ট, গোটা গোটা। আহা হা! মুর্শিদাবাদের বাবুর্চির তৈরি। অমন আর জীবনে জিবে ঠেকাওনি!

তন্বী : ঐ মাটির হাঁড়ি দুটোর মধ্যে কী ?

সর্দার : একেবারে আসল গন্ধবণিকের, প্রাণহরা আর মালাই দৈ।

তন্বী : কী বলেছিলাম!

তরুণ : আপনার কেন দুরবিন দরকার হয় না জানি। আপনার চোখে দুরবিন লাগানো রয়েছে।

কুলসুম : কিন্তু লোকটা কে ? তোমাদের এ খাবার উনি পেলেন কোথ্থেকে ? ওর পরিচয় কী ? আমাদের খোঁজ পেলেন কী করে ?

সর্দার : সে খবর পরে নেব। কমরেড্স, এ্যাটেনশন প্লিজ। আমি আমার সর্দারীটা আবার শুরু করতে চাই। যা বলব সবাই মনযোগ দিয়ে শুনুন এবং সেই মতো চলুন। এই লোকটা যেই হোক না কেন—

তরুণ : অন্যকিছুই হতেই পারে না। স্বর্গীয় দূত!

সর্দার : উনি আমাদের প্রাণ বাঁচাবেন এখন। আমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কোনো কার্পণ্য না করি। এক্ষুণি এসে পড়বে। আমার ইচ্ছে ওঁর পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিগেডিয়ার একবার সম্মানসূচক বিউগল বাজাবে। তারপর আমবা সবাই তাঁকে সাধ্যমত রাজকীয় অভ্যর্থনা জানাব। সময় নেই আব। ব্রিগেডিয়ার!

(নেচে নেচে বিউগল বেজে ওঠে। প্রবেশ করে প্রথমে দুজন মুটে, খাবারের হাঁড়িকুড়ি থালাবাটি কেতলি নিয়ে। পেছনে পেছনে মধ্যবয়সী একজন সাধারণ লোক। প্রথমে হুল্লোড়, তারপর সর্দারের সংকেতে সকলে সংযত। মাঝে মাঝে তবু কারো কারো হাত খাবার সরাচ্ছে।)

সর্দার : কমরেডস্ এ্যাটেনশন প্লিজ়। (আগন্তুককে) আসুন, আসুন। মাঝখানে এসে বসুন। আপনাকে আজ আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা যে সৌভাগ্য এবং মুক্তির স্বাদ পেলাম তা যুগে যুগে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তন্বী : আপনি মহৎ, আপনি মহান। দেশের ও দশের কল্যাণ, জাতি ও রাষ্ট্রের স্বার্থ আপনার মতো বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ণধী ব্যক্তির হাতে পড়লে দুঃখি ও নিরন্নজন নিশ্চিন্ত হতে পারত।

মোমেন : (আপন মনে) মাছটা বোধ হয় পচে যাবে। পুকুরে বেঁধে রেখে এলেই পারতাম। ওঁকে দেখাবার শখ মেটাতে গিয়ে এখন-কি দরকার ছিল ওঁর সঙ্গে ডিসকাস্ করার!

তরুণ : সৈনিক সঙ্গে ছিল তাই তূর্যধ্বনি দ্বারা আপনাকে আমরা অভিনন্দন জানিয়েছি। মালিনী ছিল কিন্তু মালঞ্চের অভাবে আপনাকে ফুলহার উপহার দিতে পারলাম না। আছে হৃদয় তা মুক্ত ও প্রসারিত করে দিয়ে আমরা আপনাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। আপনি আমাদের সংকটকালের মুক্তিদাতা, আপনিই আমাদের একমাত্র পরিত্রাণকর্তা!

কুলসুম : আপনি দেবতা, অবতার,ফেরেশতা, ফকির, দরবেশ, আউলিয়া, সেইন্ট সব!

(কিছু খাদ্য মুখে পোরে)

তন্বী : কিন্তু সত্যি আপনি কে ? আপনি মর্তের না ঊর্ধ্বের ? সব বিশ্বাস করতে রাজি আছি।

তরুণ : আপনার পরিচয় পেয়েছি আপনার কর্মে। উপলব্ধি করেছি যে আপনি সর্বদর্শী এবং সর্বত্রগামী। বুঝেছি আপনি বুদ্ধ যিশু কৃষ্ণের পরমাত্মীয়।

মোমেন : সর্দারজী। একটা জিন্দাবাদ দিয়ে দি। ই ন কা লা বা—

সকলে : জিন্দাবাদ!

আগন্তুক : আমি সামান্য লোক। আপনাদের দোয়ায়- (প্রতিবাদের গুঞ্জন, আপনি অসামান্য, তুলনাহীন ইত্যাদি) সামান্য চাকরি করি। কিছু অন্যরকম খবর ছিল তাই আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছিলাম। বুঝলেন না, সঙ্গের জিনিসপত্রের ওপর কড়া নজর রাখা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। আপনারা যখন হৈ চৈ করে কোনো জিনিস না নামিয়েই নিজেরা স্টেশনে নেমে পড়লেন, ধরা পড়ে যাবার ভয়ে আমি না পারলাম আপনাদের ডাকতে, না পারলাম জিনিসগুলো ছেড়ে নেমে পড়তে। ফলভোগ করলাম। তিন স্টেশন পর ক্রসিং পেলাম, গাড়ি পাল্টে জিনিসপত্র সব নিয়ে এই এখন এলাম। বিউগলের সংকেত জানা ছিল, শুনে শুনে সোজা এখানে চলে এসেছি। সত্যি আপনাদের ভাষা ভাব ভঙ্গি-পিকনিকের এত সব উদ্‌ভট নিয়ম সংকেত—দেখে প্রথম প্রথম—ওকি আপনারা কেউ কোনো কথা বলছেন না কেন ? হাত তুলে বসে রয়েছেন কেন ? খান। আমাকেও কিছু খেতে দিন। সে-কী ? সব এ র ক ম - ?

সকলে : আপনি কে ? আপনি কে ?

আগুন্তুক : সামান্য লোক। আমি কিছু না, সামান্য চাকরি করি। এই আই বি অফিসে। আপনাদের কোনো উপকারে এসে থাকলে সে মানে-!

[সব নিশ্চল, স্তব্ধ]

একতালা-দোতালা

চরিত্র

বশির

দুলাভাই

ভৃত্য

আয়েষা

আপা

[এক নারী অনেক কাগজপত্র সামনে মেলে রেখে এক পুরুষকে নানা রকম প্রশ্ন করছে এবং মাঝে মাঝে জবাব টুকছে]

নারী : নাম ?

পুরুষ : নাজমুল বশীর।

নারী : লেখা-পড়া ?

বশীর : এমবিবিএস।

নারী : পেশা ?

বশীর : একাধিক।

নারী : যেমন ?

বশীব : ডাক্তাবি। এটাই প্রধান চাকরি। তবে ইলেকট্রিক কিম্বা ইলেকট্রনিকের যন্ত্রপাতিও মেরামত করি। পত্র-পত্রিকায় লিখি, শাক-সব্জির বাগান কবি।

নাবী : পবিবার ?

বশীব : বিয়ে করিনি।

নাবী : সঙ্গে কে কে থাকে ?

বশীব : আপাতত এক ভাগ্নে, এক আর্দালি।

নাবী : বারান্দায় শাড়ি শুকুচ্ছে কার ?

বশীর : কি বললেন ?

নারী : শাড়ি। বারান্দায়। দেখেননি ?

বশীব : আশ্চর্য!

নাবী : কাকে বলছেন, আমাকে ?

বশীর : আপনি কি শাড়িও গণনা করেন না কি ?

নারী : সব সময় নয়। কখনও কখনও। জবাবের সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা করে দেখবাব জন্য সকল রকম প্রশ্নই করতে হয়। তবে লিখি কেবল সেগুলো যেগুলো ছাপান ফর্মে প্রশ্নের আকারে উল্লেখ করা রয়েছে। আপনি চটবেন না। যা ইচ্ছে তা-ই বলবেন আমাকে সম্বোধন করতে যাতে অসুবিধা না হয় সে-জন্যে নিজের নামটা আবার বলে রাখছি, আয়েষা, আয়েষা আখতাব। মিস আয়েষা আখতার।

বশীর : সত্যি সত্যি কোনো রকম গবেষণার কাজে আপনি নিযুক্ত আছেন বিশ্বাস করি না। হাতে এক গোছা প্রশ্নপত্র নিয়ে নিরীহ গৃহস্থকে কিছুক্ষণের জন্য ব্যতিব্যস্ত করে তোলা ছাড়া আপনার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই।

আয়েষা : সব ঘরে উৎপাত করি না। আপনি ব্যান্ডম স্যাম্পলিং বোঝেন ? এলোমেলো

বাছাই করবারও একটা হিসাব আছে। সেই হিসাবে দৈবাৎ আপনার বাড়ির নম্বর আমার তালিকায় উঠে গেছে বলে আপনাকে উত্ত্যক্ত করছি।

বশীর : আমি সহজে উত্ত্যক্ত হই না। বিশেষ করে না চেঁচিয়ে যারা ধীরে সুস্থে কথা বলতে পারে তাদের দ্বারা কখনই উত্ত্যক্ত হই না।

আয়েষা : কী করলে উত্ত্যক্ত হন।

বশীর : বলব কেন ?

আয়েষা : বাঃ আমাকে না বললে চলবে কেন ? আমিতো এগুলোই খোঁজ করছি। বাড়ি বাড়ি ঘুরে খোঁজ নিচ্ছি পাড়া-পড়শির মধ্যে সুসম্পর্ক বিনষ্ট হয় কেন, কে কাকে কীভাবে উত্ত্যক্ত করে, সামাজিকদের মধ্যে পারস্পরিক মন কষাকষির কার্যকারণ কী কী ? আমার গবেষণামূলক জরিপ কার্যের এটাইতো আসল এলাকা।

বশীর : আমি কখনোই উত্ত্যক্ত হই না। কারো পক্ষেই আমার মেজাজ নষ্ট করা কঠিন। আপনি নিজেও নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন যে, যে-কোনো অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করবার ক্ষমতা আমার অপবিসীম।

আয়েষা : বারান্দায় শাড়িটা মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। তুলে ভালো করে শুকুতে দেব ?

বশীর : কী বললেন ? শাড়ি ? কোথায় ? কার ?

আয়েষা : আমাকে জিজ্ঞেস করছেন?

বশীব : শাড়ি এ বাড়ির নয়। দোতালা থেকে উড়ে এসে পড়েছে।

আয়েষা : শাড়ির বাবা মা আছে ?

বশীর : আছে।

আয়েষা : কী করেন ?

বশীর : অধ্যাপনা।

আয়েষা : শাড়ি নিজে কিছু করে ?

বশীব : বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা আছে। আপনি আরো কিছু জানতে চান ? ওরা অবাঙালি। বাপ মা, বাংলা বললে বোঝে কিন্তু নিজেরা বলতে পারে না। মেয়ে ইংরেজি বাংলা উর্দু তিনটেকেই মাতৃভাষা বানিয়েছে। আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে ?

আয়েষা : আমি চিনতে পেরেছি। আপনার ওপর তলাতেই ওঁরা থাকেন জানতাম না।

বশীর : এখন জেনেছেন।

আয়েষা : হুম। এসব সত্ত্বেও আপনার ক্ষেত্রে উপর-নিচ তলায় কোনো বিরোধ নেই।

বশীর : এসব সত্ত্বেও মানে কী ? কেন থাকবে। আমরা কেউ চেঁচিয়ে কথা বলি না, এর ওর মাথার ওপর অষ্টপ্রহর ঢেঁকি-মুগুর চালাই না। কোনো গোলমাল নেই। নিরিবিলি যে যার কাজ নিয়ে থাকি। ইচ্ছে হলে তাকাই, না হলে তাকাই না। প্রয়োজন হলে কথা বলি, নইলে বলি না। বিরোধ থাকবে কেন ?

আয়েষা : জি।

বশীর : আরো কিছু প্রশ্ন করবেন ?

আয়েষা : না। তবে মানে আমি আরো কিছুক্ষণের জন্য আপনার এখানে অপেক্ষা করতে পারি ?

বশীর : নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। কিন্তু, মানে, কেন ?

আয়েষা : কী বলব ঠিক বুঝতে পারছি না। একজন লোক আমাকে ফলো করছে।

বশীর : বলেন কী ? বেরিয়ে গিয়ে দেখে আসব ?

আয়েষা : না না তার দরকার নেই। আমি চাই ও এসে দেখে যাক।

বশীব : আপনি তা হলে ওকে চেনেন ? কী দেখে যাবে ?

(দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ)

আয়েষা : চুপ জবাব দেবেন না।

বশীর : কেন ?

আয়েষা : আরো কয়েকবার ধাক্কা দিক।

বশীর : কী যাতা বলছেন। (দরজায় জোরে ঘা পড়তে থাকে)
উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে নিয়ে আসুন।

আয়েষা : পারব না।

বশীর : পারব না মানে কী ? আপনার চেনা লোক। এতক্ষণ পরে শেষে আমি গিয়ে ওর সামনে দরজা খুলে দাঁড়াব ?

আয়েষা : কী করবে ?

বশীর : কিছু করার কথা হচ্ছে না। কিন্তু দৈবাৎ যদি-

আয়েষা : অত কথা ভাবার আর সময় নেই। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। যান, তাড়াতাড়ি যান। দরজাটা খুলে দিন। দেরি করছেন কেন, গিয়ে দরজাটা খুলে দিন।

বশীর : আশ্চর্য!

(দরজা খুলে দেয়)

আয়েষা : এ-কী ? এ কোত্থেকে এল ?

বশীর : কী চাই ? কাকে খুঁজছিস ?

ভৃত্য : বড় আপার লাল শাড়িটা নাকি উইড়া আইস্যা আপনার বারান্দায় পড়ছে!

বশীর : ভেতরে এসে নিয়ে যা।

ভৃত্য : তাইতো। বড় আপার শাড়িই তো। শুকনা শাড়ি কি না। বাতাস না লাগতেই উইড়া আইছে।

বশীর : বেশি বকিস না । যা।

ভৃত্য : যাই। যাই আপা।

(প্রস্থান। যাবার সময় দরজাটা টেনে দিয়ে যায়)

আয়েষা : এ-রকম যে ঘটতে পারে আমি আশা করিনি।

বশীর : কী আশা করেছিলেন ?

আয়েষা : মানে, আমি ভাবিনি যে ওপর তালা থেকে কেউ এসে দেখে যাবে ? আমি সত্যি লজ্জিত।

বশীর : যা আশা করেছিলেন তা ঘটলে লজ্জিত হতেন না ?

আয়েষা : আমার কথা ছেড়ে দিন। আপনার কী হবে এখন ?

বশীব : কপালে যাই থাকে তাই হবে। কিন্তু আপনাকে দিয়ে তাব সংস্কার সাধন করাতে চাই না। আপনি স্বচ্ছন্দে বিদায় নিতে পারেন।

আয়েষা : আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু ছিঃ ছিঃ। এ আমি কী করে গেলাম। চাকর ব্যাটা ওপরে গিয়ে কত রকম কথা রটাবে কে জানে ?

বশীর : এটা ভদ্র পাড়া এখানকার বাসিন্দারা সকলেই অল্প বিস্তর শিক্ষিত। চাকর-বাকরের কথায় তারা উত্তেজিত বোধ করবে এতটা আমি মনে করি না।

আয়েষা : শুধু চাকর কিনা কে জানে ? হয়তো দূত প্রেরিত হয়ে এসেছিল।

বশীর : সবকিছুই নিতান্ত স্ত্রীলোকের মতো বিচার করছেন। এত লেখা-পড়া কবেও মনের গড়ন বদলাতে পারেননি।

আয়েষা : কী জন্যে বদলাব ? যিনি দূত পাঠিয়েছিলেন তাঁব জাত আমার জাত আলাদা নয়। আমার মন যদি ছোট হয তবে তাঁরটাও তাই।

বশীর : তাঁরটা তা নয়। হতে পারে না।

আয়েষা : কেন, পাঞ্জাবি বলে ?

বশীর : উর্দূ বললেই সকলে পাঞ্জাবি হয়ে যায় না।

আয়েষা : না হলো। মেয়ে মেয়েই, সে দেশিই হোক আর খোট্টাই হোক।

বশীর : খোট্টা খোট্টা কবছেন কাকে ?

(বার থেকে কেউ দরজায় ধাক্কা দেয়।)

বশীর : দরজার ছিটকানিটা আবার পড়ে গেল কখন ?

আয়েষা : এসে গেছেন। এবার সামলান।

বশীব : কে এসেছে ?

আয়েষা : কে আবার ? একটু আগে পতাকা গুটিয়ে দূত চলে গিয়েছিল, এবার নিশ্চয়ই মুনিব স্বয়ং এসেছেন। দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন, দরজা খুলে সংবর্ধনা জানান।

বশীর : আমার চেয়ে আপনার আগ্রহ বেশি। আপনি যান।

আযেষা : দেখে নিতে চায় আপনাকে, আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াব কোন্ সাহসে ?

বশীব : আপনি তো আচ্ছা মেয়ে মানুষ। গবেষণার নাম করে এখন নাটকের তালিম দিচ্ছেন। অকারণ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কেউ উত্তেজিত হয়ে উঠলেই আমি শরমে-ডরে একেবারে দিশাহাবা হয়ে যাব, সে রকম ব্যাচেলব আমি নই।

আয়েষা : আপনার দুঃসাহস বেশি হয়ে যাচ্ছে। আর দেরি করলে উনি হয়ত আর নিজেকে সামলাতে পারবেন না। মেয়ে হলেও পাঞ্জাবি। হয়তো দরজা ভেঙ্গে ঢুকে পড়বেন।

বশীর : আপনাকে বলছি উনি পাঞ্জাবি নন।

আয়েষা : এই-রে ভেঙ্গে ফেলল বুঝি !

বশীব : ফেলুক! এত ছোট যাব মন তাব কিছু শিক্ষা হওয়া দরকার। আপনি আরও ঘন হয়ে বসুন।

আয়েষা : আপনি দেখি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছেন। আমার কিন্তু ভয় করছে।

বশীর : খবরদার আসন ছেড়ে উঠতে পাববেন না।

আয়েষা : অসহ্য! না, না, এ আমি কিছুতেই হতে দেব না।

বশীর : আপনাকে আমি দরজা খুলে দিতে নিষেধ করছি।

আয়েষা : অসম্ভব!

(ছুটে গিয়ে দবজা খুলে দেয়। ঘরে ঢোকেন এক মাঝারি বয়সের মোটাসোটা ভদ্রলোক।)

বশীর : একি, দুলাভাই আপনি ?

দুলাভাই : ডাকাত মনে করেছিলে নাকি ?

আয়েষা : না, মানে, আমি ভয়ে একেবারে-

বশীর : আপনাকে কিছু বলতে হবে না।

দুলাভাই : ডাক্তাব ঠিকই বলেছে। আমাকে বুঝিয়ে বলার কিছুই আবশ্যক নেই। চিকিৎসা ডাক্তারকেই করতে হবে, যা বলতে হয় ওকেই বুঝিয়ে বলেন।

বশীর : রোগী নিয়ে এসব বসিকতা আমি আদৌ পছন্দ করি না।

আয়েষা : (দুলাভাইকে) এ ঘরে ঢুকতে আপনাকে কেউ দেখেছে কি ? বাইরে আপনার আশেপাশে কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেননি?

দুলাভাই : একজন'ত পাশেই ছিলেন

আয়েষা কোন দিকে চলে গেলেন ?

দুলাভাই : দরজা খুলতে দেবি হচ্ছে দেখে উনি আর অপেক্ষা করলেন না। দো'তালায় উঠে গেছেন কিন্তু সে-সব শুনে আপনার কী লাভ

আয়েষা : আপনি বুঝবেন না। ডাক্তাব সাহেব নিশ্চয় কোনো বদ মতলবে ওপরে উঠে গেছে। আমি আর এক মুহূর্তও এখানে থাকছি না। অযথা একটা বিপদ টেনে এনে এখন আপনাকে একা ফেলে রেখে চলে যেতে হচ্ছে বলে আমি সত্যি খুব লজ্জিত।

দুলাভাই . আমি রয়েছি

আয়েষা আল্লা আপনাকেও রক্ষা করুক!

(কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে চলে যায়।)

দুলাভাই : মেয়েটি কে ?

বশীর : চিনি না।

দুলাভাই : লাখ কথার এক কথা। তোমার আপার কথাই ধরো। কম দিন হলো না, এক সঙ্গে ঘর করছি। কিন্তু তাই বলে কি তাকে আজও ষোল আনা চিনে উঠতে পারলাম ?

বশীর : মেজাজ ভালো নেই, এখন বেশি বাজে বকবেন না।

দুলাভাই : ভাই না থাকারই কথা। কারণ, এই যে এই মাত্র চলে গেল, ও বলে বটে বাংলা কিন্তু জবান বড় কড়া। আমার তো সন্দেহ হয়, তোমার ওপব তলার অতি প্রশংসিত গৃহবাসিনীর মতো ইনিও আসলে পাঞ্জাবিনী, বিপাকে পড়ে বাঙ্গালিনী বনেছেন।

বশীর : আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছি মেয়ে মেয়েই। ওর জাত-বেজাত নেই, ভাষা-অভাষা নেই। বাঙ্গালি হোক, পাঞ্জাবি হোক, লেখাপড়া জানুক আব না জানুক নিচতায় সব সমান। এক সময় না এক সময় মুখোশ খসে পড়বেই।

দুলাভাই : এ অবশ্য আরেকটা দৃষ্টিকোণের কথা। কিন্তু আমি ভাবছি তোমার আপা ওপরে চলে গেলেন বলে ও মেয়ে অতি উত্তেজিত হয়ে উঠল কেন ?

বশীর : কে ? আপা এসেছেন ?

দুলাভাই : তোমার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, তারপর হঠাৎ কি মনে করে ওপর তলার মেয়েটির সঙ্গে আগে একটু গল্প করে আসি বলে তরতর করে ওপবে উঠে গেলেন। আমি বাপু অন্য প্রকৃতির লোক। তোমাদের ভাই-বোনের এই খোট্টাপ্রীতির মর্ম বুঝি না।

(ওপর তলা থেকে বিকটাকার দুমদুম শব্দ ভেসে আসে)

ও কিসের শব্দ ?

বশীর : এ-রকম হতে তো আগে কখনো শুনিনি।

দুলাভাই : ভায়া ক্রমশ সব প্রকাশ পাচ্ছে। পূর্ব পশ্চিম চরিয়ে খাই, জানি না কার ভেতর কি।

বশীর : অসহ্য!

(বারান্দার দিকে বেরিয়ে যায়)

(নেপথ্যে, চিৎকার করে, 'ওপরে এত শব্দ হচ্ছে কীসের ?' চিৎকার করে ওপর তলার ভৃত্য জবাব দেয় "আপা কাপর্ড় কাচতাছেন। কইছেন মুগুর দিয়া না পিটাইলে শাড়ি সাফ হয় না।)

(রাগে গরগর করতে করতে বশীর ঘরে ঢোকে।")

দুলাভাই : সব দোষ তোমার। যদি তুমি উৎসাহ না দিতে তবে ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই সালওয়ার কামিজ ফেলে শাড়ি ধরতেন না। এবং যদি না ধরতেন তাহলে তোমাকেও, মাথার ওপরে বসে, মুগুর দিয়ে পেটাতে পারতেন না।

(দুম দুম্ দুম্। দুম্ দুম্। দুম্ দুম্)

বশীর : (চড়া গলায়) জানি। আমিও জানি। নানা রকম শব্দ তৈরি করার যন্ত্র আমারও আছে। আমিও দেখে নেব।

(বলতে বলতে তার লম্বা করে টেনে ঘরের টেপরেকর্ডারটা বারান্দায় বার করে নিয়ে যায়। ফিরে এসে সেলফ ঘেঁটে একটা টেপ বেছে হাতে তুলে নেয়।)

দুলাভাই : এটা কী ?

বশীর : চিড়িয়াখানার সর্ব প্রকার জীবজন্তুর চিৎকার। বারান্দার কোণ থেকে ওদের ঘর বরাবর স্পীকার তাক করে বসিয়ে টপ ভল্যুমে চড়িয়ে দেব। প্রতিবেশির পেছনে লাগার মজা টের পাবেন। (বেরিয়ে যায়)

(দুম্ দুম্ দুম্ দুম্।)

(হঠাৎ ওপর তলার শব্দ ছাপিয়ে সিংহ ব্যাঘ্র যাবতীয় বন্য জন্তুর প্রচণ্ড গর্জন ধ্বনি হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে ওপর তলা থেকে একটা ভয়ার্ত আর্তনাদ। সব নিস্তব্ধ)

(সদর্পে হাসতে হাসতে ঘরে প্রবেশ করে বশীর)

দুলাভাই : সাবাস, সাবাস, জোয়ান। বাঙ্গালির মুখ বক্ষা করেছ। এইতো চাই। কেবল মুখ বুঁজে সহ্য কর বলেই, ওদের সাহস এত বেড়ে গেছে।

বশীর : থোতা মুখ ভোঁতা করে দিতে আমরাও জানি।

দুলাভাই : জানলেই হবে। না জানলে টিকে থাকবে কী করে ? চুপ করে সব মেনে যাও বলেই ওরা ভাবে আমরা ভীরু দুর্বল। রুখে দাঁড়াও দেখবে সব ঠাণ্ডা!

(ঠিক মাথার ওপরে শব্দ হতে থাকে ঝম্বর ঝন্ ঝন্ । ঝম্বর ঝন্ ঝনাৎ। ঝন্ ঝন্।)

ও কীসের শব্দ ?

বশীর : হামানদিস্তা!

দুলাভাই : তোমাদের দেখছি বেড়ে জুটি হয়েছে। তুমি এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার উনি হেকেমী দাওয়াখানার হামানদিস্তা চালানকারিণী! সাধে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে এত টান।

বশীর : দেখাচ্ছি। আমিও মজা দেখাচ্ছি। কাকে ঘাঁটাতে এসেছ টের পাওনি এখনও। বলতে বলতে ছুটে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

(দুলাভাই একলা ঘরের মধ্যে পায়চারি করেন্। মাথার ওপর হমানদিস্তা পূর্ণদ্যমে চলতে থাকে। এবার তৎসঙ্গে শুরু হয় ছাদ পেটানো সুরে খড়ড়াৎ-খড়ড়াৎ-খড়ড়াৎ জোড়া জোড়া শব্দ।)

দুলাভাই : খড়ম পিটিয়ে পিটিয়ে নিশ্চয়ই সঙ্গে আরেকজন কেউ তাল দিচ্ছেন! (শব্দ বাড়ে) বোধহয় কার্পেট তুলে ফেলেছে, নইলে সবটা একেবারে এত খুলির কাছে মনে হচ্ছে কেন ?

(পকেট থেকে রুমাল বার করে সেটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। দুটো পুটলি বানিয়ে নিজের দু'কানে ছিপি এটে দেয়। দলা

পাকিয়ে আরও দুটো বানিয়ে সামনে সাজিয়ে রাখে। হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢোকে বশীর। একহাতে একটা ছোট বেঁটে দুরমুজ। অন্য হাতে কাগজের ঠোংগা। মাথার ওপর শব্দ সমান তালে চলছে।)

বশীর : একটু দেরি হয়ে গেল। মোড় পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। দুরমুজটা অবশ্য বাগানেই ছিল।

দুলাভাই : দুরমুজ দিয়ে কী হবে। উনি তো থাকেন তোমার মাথার ওপর।

বশীর : দেখাচ্ছি।

(টেবিলটা একটু পবিষ্কার করে তার ওপর চেয়ার চাপায়। টেনে দুলাভাইকে তার ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়। নিজে চেয়ার চেপে ধরে রাখে। দুরমুজটা দুলাভাইয়ের হাতে তুলে দিয়ে ইশারায় নির্দেশ দেয়, কি করে সেটা দিয়ে জোরে জোরে ছাদে গুঁতো মারতে হবে। দুলাভাই সোৎসাহে দু'হাতে মাথার ওপরে তুলে জোরে দুরমুজ মারে ছাদে। ঘর কেঁপে ওঠে, ওপরের শব্দ থেমে যায়। বশীর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। দুলাভাই যোগ দেয়। উভয়কে স্তব্ধ কবে দিয়ে ওপরের বাদ্য হামানদিস্তা ও খড়মের শব্দ আরো প্রবল হয়। তারপর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চলতে থাকে। নিচ থেকে দুরমুজ, ওপর থেকে হামানদিস্তা ও খড়ম। বশীর ও দুলাভাইয়ের ঘাম ছুটে যায়।)

বশীর : থামুন একটু। ভেবেছিলাম হয়তো দরকার হবে না। এবার এক রাউন্ড এই চালান দেখি।

(ঠোংগা থেকে লাল নীল কাগজ মোড়া ছোটবড় কয়েকটা পটকা বাব কবে। দুরমুজের মাথায় একটা পটকা বসিয়ে সাবধানে দুলাভাইয়েব হাতে তুলে দেয়। দুলাভাই ছাদ বরাবর তুলে তাক্ ঠিক কবে। ওপব তালার শব্দ আবেকবার বাড়তেই প্রচণ্ড বেগে দুরমুজ মারে। বোমা ফাটার ভয়ানক শব্দ হয়। ওপর তলায় কে যেন চিৎকার করে ওঠে। স্তব্ধতা। দুদ্দাড় করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে এক ধাক্কায় যিনি দবজা খুলে ঘবে ঢোকেন তিনি বশীরের আপা।)

দুলাভাই : এই যে, তুমি এসে পড়েছ দেখছি। সব কি রকম দেখলে ?

আপা : পাগল। তোমরা সব বদ্ধ পাগল। বন্ধ করবে এসব ?

বশীর : কেন ? শুরু করেছে কে ?

আপা : সে নিয়ে তোর সঙ্গে আমি তর্ক করতে পারব না। সব দোষ আমারই আমি কী করে জানব যে ওদের চাকব ছোকরা আগে থেকেই ওকে তোর ঘবে কে-না-কে এসেছিল তার সম্পর্কে অনেক কথা শুনিয়ে রেখেছে। বাড়িতে অন্য কেউ নেই, আমি যেতেই জিজ্ঞেস করল তোব ঘরে কে এসেছে। কিছু না বুঝে ফস করে বলে ফেললাম, কি করে জানব, দবজাই খোলাতে পারলাম না।

বশীব : আপনি এ কথা বলতে পারলেন ? উহ কী ঝামেলাতেই না পড়লাম।

আপা : শুনে রেগে লাল হয়ে ও গুদাম থেকে মুগুর হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল।

দুলাভাই : এ্যাঁ ?

(পড়ে যেতে যেতে সামলে নেয়)

আপা : তারপর সোজা গোসলখানায় পিঁড়ি পেতে বসে পানিতে ভেজান শাড়ি দমাদম মুগুর দিয়ে পিটিয়ে সাফ করতে লেগে গেল।

বশীর : উচিত হয়নি। সর্দিতো আছেই, গতরাতে টেম্পারেচারও ছিল।

আপা : এত যদি জানতেই তবে সকাল বেলা ওপর তলায় ছুটে না গিয়ে দরজা সেটে নিজের ঘরে বসে থাকলে কেন ?

দুলাভাই : তাই বলে ও মুগুর দিয়ে শাড়ি পিটবে।

আপা : সে-সুখও তোমাদের সহ্য হলো না। এমন বাঘের হুংকার ছাড়লে যে ওর হাতের মুগুর পিছলে পড়ে পায়ের একটা আঙ্গুলই থেতলে গেল!

দুলাভাই : ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

বশীর : কোন্ আঙ্গুলে লেগেছে ? কোন্ পায়ের কোন্ আঙ্গুলে ? থেতলে গেছে মানে কী ? নীল হয়ে ফুলে উঠেছে ?

আপা : আমাকে দেখতে দিলে তো। এসে বসল হামানদিস্তা নিয়ে, তোর মাথার ওপর। আমিও ক্ষেপে গেলাম। গোসলখানা থেকে খড়ম জোড়া তুলে নিয়ে ওর সঙ্গে তাল ঠুকতে লাগলাম।

দুলাভাই : ও-জন্যে তোমাব লজ্জা বোধ করা উচিত।

আপা : বলতে এতটুকু লজ্জা হলো না তোমার! মেয়েটার কি আর কিছু বাকি রেখেছ তোমরা ? মাথার ওপবের দিকে তোমরা দুবমুজ চালাতে পার স্বপ্নেও ও মেয়ে ভাবতে পারেনি। হঠাৎ এত চমকে ওঠে যে হাতের তাল সামলাতে না পেরে একটা আঙ্গুলই নিজের হামানদিস্তায় পিষে দিল।

বশীব : কী বললেন ? মিথ্যে কথা। কোন্ আঙ্গুল ? নিশ্চয় বাঁ হাতের যে আঙ্গুলে পাথর বসান সোনার আংটি পবানো।

আপা : জানি না বাপু। ইচ্ছে হয় নিজে গিয়ে দেখে এস।

বশীব : আমি যাব ?

আপা : তুমি যাবে না তো আমি যাব ! অজ্ঞান হযে দাঁত কপাটি লেগে যে মেয়ে উল্টে পড়ে আছে আমি চিকিৎসা কবে তার জ্ঞান ফেরাতে পারব ?

বশীর : (আর্তনাদ কবে ওঠে) অজ্ঞান হয়ে পড়েছে ?

আপা : ওকি লোহালক্কড় নাকি, অজ্ঞান হবে না ? দালানে দাঁড়িয়ে পায়ের নিচে বোমা ফাটতে শুনলে মানুষ অজ্ঞান হবে না ?

বশীব আমি যাই আপা।

(আচমকা চেয়াব ছেড়ে দিতেই দুলাভাই গড়িয়ে নিচে পড়ে যায়। বশীব কোনো বকমে স্টেথিসকোপটা হাতে তুলে নিয়ে দবজাব দিকে ছোটে। এক

নজর পেছনের দিকে তাকিয়ে) ওঁর কিছু হয়নি আপা। যদি জ্ঞান হারিয়ে থাকেন তবে মাথায় কিছু পানি ঢেলে দেবেন। (ছুটে বেরিয়ে যায়)

(আপা দুলাভাইকে টেনে তোলে। আপার হাত থেকে নিয়ে এক গ্লাস পানি খায়। রুমালে মুখ মোছে। আপা ঘর গোছাতে চেষ্টা করে। দৌড়ে এসে দুলাভাই পটকাগুলো ঠোংগায় ভরে, সন্তর্পণে এক কোণে ঠেলে রাখে। আপা ব্যাগ থেকে চিরুনি বার করে দিলে তা দিয়ে চুল আঁচড়ে নিয়ে আপার পাশে গিয়ে বসে। ওপর থেকে সঙ্গীতের মৃদু রেশ ভেসে আসে। ছাদের দিকে চোখ উল্টে দিয়ে দুলাভাই বিস্মিত হয়।)

আপা : ওদের নতুন রেডিওগ্রাম। আমাকে বলছিল। কোথায় যেন গোলমাল হওয়াতে ওরা কেউ বাজাতে পারছিল না। বোধ হয় বশীর গিয়ে এখন ঠিক করে দিল।

দুলাভাই : (সুরের সঙ্গে দেহ দোলায়) আরেকটু জোরে বাজালেই পারে, আমরাও শুনতে পারতাম।

আপা : তোমার যেমন কাণ্ডজ্ঞান।

(মৃদু সংগীত ধ্বনি বুকে করে করে পর্দা নামে)

মিলিটারী

চরিত্র

মেয়ে

তরুণ

ওস্তাদ

পাগলা

মিলিটারী দুজন

[অন্ধকার রাত। বদ্ধ গলি। গলির খোলা মুখ মঞ্চের ডান দিকে। বাঁ দিকের শেষ বাড়ির সদর দরজা। দরজার সামনে এক ফালি খোলা বারান্দা, চওড়া নয়, কিন্তু রাস্তা থেকে কিছু উঁচু। মঞ্চের পেছনটা গলির ওপার, এক সারি ঘরবাড়ির আভাস দেয়া। গলির এপারে দর্শক।

মঞ্চের দু'ধারে ঢেউটিনের দুটো বড়ো ডাস্টবিন। ডান ধারের ডাস্টবিন ঘেঁষে একটা ল্যাম্পপোস্ট। তার আলোটা না থাকার মতো। আলোহীন মঞ্চ। নিরব। স্তব্ধ। সামনে বাস্কেট ঝোলানো সাইকেল চড়ে অত্যন্ত বেগে সিগারেট মুখে এক তরুণ প্রবেশ করে। সাইকেলটা বারান্দায় ঠেকিয়ে রেখে লোকটা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কী ভাবে। সাইকেলের আলোটা নিবিয়ে দেয়। প্রায় আস্ত সিগারেটটাই না নিবিয়ে ছুঁড়ে মারে ডাস্টবিনের মধ্যে। সাইকেলেব ঘন্টাটা বিশেষভাবে বাজায়। তারপর বারান্দার অন্ধকারে নিজেকে বিলীন করে দেয় যেনো।

ভেতর থেকে সন্তর্পণে কে দরজা খুলতেই এক ঝলক আলো ছিটকে পড়ে গলির বুকে। একটি উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে ঘরের চৌকাঠে পা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়ায়। ভয় পাওয়া-না-পাওয়ার মধ্য-সীমানায় গলা রেখে অন্ধকারে স্থিরদৃষ্টি মেলে ধরে। মেয়েটি কথা বলে।]

মেয়ে : কে ? ওখানে কে ?

তরুণ : আমি।

মেয়ে : তুমি ? কি ভয়ই পেয়েছিলাম!

(অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দরজায় পিঠ দিয়ে সারা মুখে আলো মেখে মেয়েটি স্থির হয়ে দাঁড়ায়।)

তরুণ : তোমার চোখে, মুখে গলায়- তোমার দাঁড়াবার আঁকাবুকি রেখামালার কোনোখানে, ভয়ের চিহ্নমাত্র ছিল না।

মেয়ে : কিসের চিহ্ন ছিল!

তরুণ : লোভের (গর্বের) গ্রাসের।

মেয়ে : তোমাব সঙ্গে উদ্ভট কথার পাল্লা দিয়ে জিতব, এত জ্ঞানবুদ্ধি আমার নেই। দোহাই তোমার, আমার বুকের কাঁপুনি এখনো থামেনি। দুটো সোজা কথার জবাব দেবে ?

তরুণ : এত সহজে আর সাগ্রহে তুমি হাব মেনে নাও যে, যখন ষোল আনা জিতবে তখনও আমি তা টের পাবো না।

মেয়ে : ক্ষতি কী ? ও কথা থাক। আমি সত্যি ভয় পেয়েছি। এখানে এ-সময় তুমি এলে কী করে ?

তরুণ : দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে।

মেয়ে : জবাবের ছিরি দেখ। তাই বলে এত রাতে? কারফিউর মধ্যে ? দাঙ্গাকে ভয় পাও না মানলাম— কিন্তু তাই বলে মিলিটারীকে ? শহর শুনেছি এখন মিলিটারীর হাতে। কারফিউর পর রাস্তায় কাউকে নড়তে চড়তে দেখলে ওরা নাকি সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছোড়ে।

তরুণ : হবে হয়তো। এখন পর্যন্ত আমার গায়ে একটাও লাগেনি।

মেয়ে : কী অলুক্ষণে কথা। তুমি ছেলেমানুষ নও। এসব পাগলামো তোমাকে শোভা পায় না।

তরুণ : আমি মনে-প্রাণে সত্যিকারে পাগল হতে জানি না, বরাবর এই অভিযোগই তোমার কাছ থেকে শুনে আসছি। হঠাৎ সুর বদলালে কেন ? ভয় পেলে নাকি ?

মেয়ে : আমি ? কী দেখে বুঝলে ?

তরুণ : তোমার কপালের ঘাম। তোমার হাতের দোমড়ানো আঁচল।

মেয়ে : খুব সাহসী হয়েছো।

তরুণ : দেখে খুশি হও। দিনের আলোতে দশজনের মাঝখানে যে আমি শুধু কথার ফুলঝুরি- বিশ্বেস কর শমি- এই মুহূর্তে, এই ঘোর অন্ধকারে , নির্জন নিষিদ্ধ রাতে আমি অন্য মানুষ। আমি ভীরু নই। তুমি সাহস করে আমাকে ডেকে ঘরের ভেতরে এসে বসতে বলো।

মেয়ে : না। সব মিথ্যে কথা।

তরুণ : এই কারফিউ, কালো, অন্ধকার, মিলিটারী টহল- এগুলো মিথ্যে কথা ?

মেয়ে : কতক্ষণের জন্য সত্য ? সকাল বেলা যখন এর কোনো ঠাঁই থাকবে না, তখন তুমি তুমিই থাকবে। কাজের কথার মানুষ বনে যাবে। তোমার নিজের লেখা সম্পাদকীয় প্রবন্ধের নিরাপদ উচ্চচিন্তায় তোমার ভেতরটা গম্‌গম্ করতে থাকবে। তোমার উন্নতির সোপান, তোমার পরম শ্রদ্ধেয় মুরুব্বিদের কাল্পনিক ভ্রুকুটিতে সন্ত্রস্ত হয়ে তখন কি তুমি আমাকে আছড়ে মেরে ফেলবে না ? তুমি চলে যাও এখান থেকে।

তরুণ : তুমি অবুঝ। আমি চললাম।

মেয়ে : সে-কী ? এই কারফিউয়ের মধ্যে কী করে যাবে ?

তরুণ : যেমন করে এসেছি।

মেয়ে : কেন এলে ?

তরুণ : তোমাকে বলতে।

মেয়ে : কী বলতে ?

তরুণ : তুমি আলোতে। আমি অন্ধকারে । এতদূরে দাঁড়িয়ে সে-কথা বললে তুমি বুঝতে পারবে না।

মেয়ে : বুঝতে চাই না। তোমার আমার সমাজ আলাদা, জগৎ আলাদা; স্বভাব, প্রবণতা সব আলাদা এসব কথা আমি কেন বুঝতে চাইব ? ধীরে সুস্থে এগুনো দরকার, অপেক্ষা করা উচিত, নইলে কারো মঙ্গল নেই! আমার

বাবা আত্মহত্যা করতে পারেন ! তোমাব চাকরি খোয়া যেতে পাবে! এত কাণ্ডজ্ঞান দিয়ে আমি কি করব, বলতে পার ?

তরুণ : আরেকটু আস্তে কথা বল। শান্ত হও। আমাকে ভিতবে এসে বসতে দাও, লক্ষ্মীটি। চারদিকের আবহাওযাটা আমাব ভালো ঠেকছে না। কিছু অঘটন ঘটা অসম্ভব নয়।

মেয়ে : আমি পরোয়া কবি না।

তরুণ : দূরে একটা ট্রাকের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা আর নিরাপদ নয়।

মেয়ে : কে চায় নিরাপত্তা। আমার বয়স হয়েছে। আমি কচি খুকি নই। আমি পড়ালেখা শিখেছি। দবকাব হলে খেটে খেতে পারব। আমি ঘব সংসাব চাই, তোমাকে চাই। এছাড়া আমার কোনো সমাজ নেই, ধন নেই, এ তুমি জান।

তরুণ : এ তোমাকে বলতে হবে কেন ?

মেয়ে : যা বলার তুমি তা কেন বলতে পারলে না।

তরুণ : বলব বলেই তো এসেছি। শান্ত হয়ে ভেতবে চল। দেরি করো না।

মেয়ে : কেন বলতে পাবলে না, শমি, তুমি বেবিয়ে এসো।

তরুণ : এতো বাতে এই কাবফিউব মধ্যে ? এই দাঙ্গাব হাঙ্গামায় ?

মেয়ে : তুমি একবাব ডাক দিয়ে পবখ করে দেখলে না কেন ?

তরুণ : শমি।

মেযে : চুপ। তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতব ছুটে এসো। মনে হচ্ছে যেন ট্রাকটা এদিকেই আসছে।

তরুণ : আমাকে ডাকছ ?

মেয়ে : আহ্! পাগল হলে নাকি ? তাড়াতাড়ি ছুটে এসো। শুনবো, শুনবো তোমার কথা এসো।

(তরুণ ঘবেব মধ্যে ঢুকবে। দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হবে গলি অন্ধকার করে। বাইরে মিলিটারী ট্রাকেব ভারী সচল ইঞ্জিন সজোরে থরথর কবে কাঁপবে। মনে হবে যেন গলিব মুখের বড় রাস্তায় ট্রাকটা একবার থামল। আবাব চলতে শুরু করল। ইঞ্জিনের শব্দ দূরে বিলীন হয়ে যাবে। মঞ্চে স্তব্ধতা। তাবপর-ডানদিকের ডাস্টবিনটাব ভেতর থেকে প্রথমে এক জোড়া হাত, পরে মাথা, ক্রমশ উঁচু হয়ে একটা আস্ত মানুষ প্রকাশিত হলো। চুলে জট, মুখ ভরা দাড়ি, নাঙ্গা শবীর। বলবান লোক, কিন্তু নোংরা। চলনে চাহনিতে পাগল-ফকিব-ভিক্ষুকের আদল।)

লোক : (বাঁ ধারের ডাস্টবিনকে লক্ষ্য করে) পাগলা, ঘুমাস নাকি ?

(বাঁ ধারের ডাস্টবিনের মধ্যে একটা দেশলাই জ্বলে ওঠে। একটা কাশির শব্দ। একরাশ ধূঁয়ো। পাগলা ভেতব থেকে উঠে দাঁড়ায়, মুখে

জ্বলন্ত সিগারেট। রোগা পাতলা গড়ন। ছেঁড়া কাপড়। হাসিখুশি মুখ।)

পাগলা : এত বিজর বিজর কবলে ঘুমায় ক্যামনে ? ওয়াগো কথা তুমি হুনছো ওস্তাদ ?

ওস্তাদ : না। আমার এই খান থাইকা সব কথা পষ্ট কানে তোলন যায় নাই। তুই নজদিক আছিলি, বেবাক তুইই লাগ পাইছস।

পাগলা : আমাব কানে লাগ পাইছে, আমি না। বুঝনেব কত চ্যাষ্টা করলাম, অঙ্গ অবশ হয়া গেল, তবু মর্ম বোঝলাম না। (জোরে সিগারেটে সুখটান দিয়ে।) ওস্তাদ আইজ রাইত আমি ঘুমামু না। ভিতবে বইয়া থাকমু। অরা আবার বাইর অইলে, হুনমু। বুঝি না বুঝি হুনমু।

ওস্তাদ : কস কি তুই ? কাম কববি না ? ব্যাপারি কাইল মাইরা লাল কইবা ফালাইব।

পাগলা : হেয়াও তো ভাবনেব কথা। চল তাড়াতাড়ি কাম গুছাইয়া ভিতবে ঢুকি।

ওস্তাদ : তুই সিগারেট পাইলি কৈ ?

পাগলা : আল্লায় মিলাইছে। ঐ যে ভিতবে গেল পোলাডা আমিব আছে। মুখেব আস্ত সিগারেট ম্যালা মাইবা ময়লা বাক্সে ফেলছে। আগুনটা ছ্যাৎ কইবা গায়ে বিধঁছিল। আমিও কম না। শব্দ করি নাই। সিগারেটটা নিবাইয়া হাতে কইরা বইসা বইছি। টানবা ? বড় ভালো মার্কা।

(দু'জনেই ডাস্টবিনেব ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। পাগলেব কৌতূহল বন্ধ দরজার প্রতি। ওস্তাদ ডান ধারেব একটা তালা ঝোলানো দোকানঘব গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখছে।)

ওস্তাদ : তুই খা। আমাব চিজ লগে আছে। পরে খামু। ঐদিকে কী দেখস ? এইদিকে আয।

পাগলা : আইলাম বইলা।

ওস্তাদ : নাঃ। আজ রাইত বুঝি ব্যাকাব যায়। একে'ত শালার মিলিটারী বেশি নটঘট শুরু কবছে। হের উপরে আবার লাইলা-মজনুব মাতামাতি। একদিক সামলাই তো আরেক দিক ফাল দিয়া উঠে। আইজ কি ধবা পড়মু নাকি ?

(টং করে সাইকেলের ঘন্টার একটা মৃদু অসতর্ক শব্দ।)

ওস্তাদ : কবস কী ?

পাগলা : এ্যাঁ। না। কিছু না। এইতো আইছি আমি। কও কী কবন লাগব।

ওস্তাদ : জায়গাটা ভালো কইবা নজর কইরা ল। এইটাই বাইনার ঘর।

পাগলা : ভালো কাঠ। ভালো জ্বলব।

ওস্তাদ : ব্যাপারি পয়সাও ভালো দিব কইছে। তাড়াতাড়ি কর।

পাগলা : আমিও তো কই তাড়াতাড়ি কর। কাম সাইবা ভিতরে যামু। হুনমু।

ওস্তাদ : আম্মক। আমার পিছে পিছে আয়। তেলেব টিন দেখাইয়া দিমু। আইনা

প্রথম ময়লার বাক্সটার পিছে রাখ। বাকিটা পরে কমু।

পাগলা : চল।

ওস্তাদ : আচানক মিলিটারী নজদিক আইলে কী করবি মনে থাকে যেন।

পাগলা : ঠাস কইরা মাটিতে পইড়া ঘুমাইয়া যামু।

ওস্তাদ : নিলে হাজত নিব। ডর কী ?

পাগলা : আমি যে হুনতে চাইছিলাম।

ওস্তাদ : আমক ! চল্, চল্।

(দুইজন বেরিয়ে যায়। ঝপাৎ করে দরজাটা খুলে যাবে। বারান্দার আলোতে এসে তরুণী দাঁড়ায়। অন্ধকারে দেখতে চেষ্টা করে। ঘর থেকে তরুণও বেরিয়ে আসে। মেয়েটি ঘুরে তার দিকে সরাসরি তাকায়। তারপর আবেগে কাঁপা গলায়—)

মেয়ে : আর এক মুহূর্ত দেরি না করে তুমি চলে যাও।

তরুণ : এইতো ভালো ভাবে সব শুনছিলে, হঠাৎ বিগড়ে গেলে কেন ?

মেয়ে : যেতে আর দেরি করলে আমি চিৎকার করে লোকজন জাগিয়ে তুলব।

তরুণ : বেশ। একটু সময় দাও। মনে হলো যেন এখনি এখানে কাদের গলা শুনেছি।

মেয়ে : সে-কী ? কোথায় ? তুমি আমাকে মিছেমিছি ভয় দেখাচ্ছ।

তরুণ : ভয় নেই। আমি দেরি করব না।

মেয়ে : প্রথমে কেন এত সাহসের ভান করলে ? কেন মিছেমিছি আমাকে জাগালে ? কেন বঞ্চনা করলে ?

তরুণ : এ তুমি কী বকছ ?

মেয়ে আমি ভেবেছিলাম এই রাত, কারফিউ, দাঙ্গার রক্তস্রোত, এই মিলিটারী টহল, সব মিলে সত্যি বুঝি তুমি পাগল হয়ে গেছ। আমাকে ছিনিয়ে নিতে ছুটে এসেছ।

তরুণ : এসেছিলাম।

মেয়ে : মিথ্যুক। তুমি স্টেশনে গিয়ে আগে সংবাদ নিয়ে এসেছো যে, বাবার আজ নাইট ডিউটি। ফিরবেন কারফিউর পর। পিসীমা দেশে। মন্টু তোমার ভক্ত। আমি দাসী। তাই এসেছ নির্ভয়ে নিষ্পাপ প্রেমকাব্য শোনাতে। নিজের মনোবিলাসকে তুষ্ট করতে যা ভুলে যাবার চেষ্টায় আমার রক্তমাংস কাদাকাদা হয়ে গেল সেখানে তুমি কেন মিথ্যে করে স্বপ্নের ফুল ফোটাতে চাইলে। তুমি বঞ্চক। তুমি নিষ্ঠুর। যাও। দূর হও।

তরুণ : (সাইকেলে হাত রেখে।) তোমার সঙ্গে এখন কথা বলা বৃথা। তোমার বাবা আজ বাড়ি থাকলেও আমি আসতাম, না এসে থাকতে পারতাম না। ছুরি, গুলি, চাকরি-সব কিছু তুচ্ছ করে তোমার কাছে ছুটে আসবার মতো মহামুহূর্ত খুঁজে পেয়েছিলাম আজ রাতে। একটা তুচ্ছ আকস্মিক

যোগাযোগের কারণে তুমি সে দুর্লভ মুহূর্তের অবমাননা করলে, শমি। দাঙ্গার প্রকোপ যদি কম থাকে, কাল আসব। আসি।

মেয়ে : বিশ্বেস করি না। কেন বিশ্বেস করবো ? কোনো প্রমাণে ? তুমি তুমিই। আমি তোমাকে জানি। তুমি চলে যাও। যেমন করে বাবা তোমাকে বলেছিল, তেমন করেই বলছি-কোনো দিন, কোনো দিন তুমি এ বাড়িতে আসবে না। আমি চাই না। চাই না। চাই না।

(তরুণ সাইকেলে উধাও। তরুণী ডুকরে কেঁদে উঠে দরজা বন্ধ করে দেয়। গলির খোলা মুখ দিয়ে সন্তর্পণে হাঁপাতে হাঁপাতে ঢুকবে ওস্তাদ এবং পাগলা। কেরোসিন-টিন বয়ে আনে পাগলা।)

(ডান ধারের ডাস্টবিনের আড়ালে তেলের টিন রেখে নিজের বাঁ দিকের ডাস্টবিনের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।)

পাগলা : মিঞা চইলা গেল না ? ফালাইয়া চইলা গেল ?

ওস্তাদ : শালা তোর কি ? জলদি জলদি কাম সার। ট্রাকটা ঘুইরা এই দিক আইতে আর দেরি নাই।

(ঝুকে পড়ে টিনের মুখ কি দিয়ে যেন চাপ দেয়।)

পাগলা : (চমকে) ওস্তাদ!

ওস্তাদ : কী রে ?

পাগলা : শব্দ অইল কীসের ?

ওস্তাদ : আম্মক। আমি টিন খুলচি। ভস কইরা ত্যাল বাইর হইচে।

পাগলা : না। কিছু আসে বোধ হয় এই দিকে। হঠাৎ থামসে।

(সট করে দুজনই লাফিয়ে যে যার ডাস্টবিনে ঢুকে পড়ে। চারদিক নিঃসাড়। একটা ট্রাকের শব্দ বাড়ে। গড়িয়ে দূরে চলে যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সবেগে সাইকেলে ঢোকে তরুণ। দুটো ঘন্টা বাজায়। অস্থির হয়ে দরজায় মৃদু টোকা দেয়। দরজা তৎক্ষণাৎ খুলে যায়। আলোর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় তরুণীও ঝাঁপিয়ে পড়ে অনির্দিষ্ট অন্ধকারে দণ্ডায়মান তরুণের বুকে। সামলে নিয়ে, কান্নায় বিকৃত মুখে উদ্ভাসিত হাসি ছড়িয়ে-)

মেয়ে : ফিরে এলে কেন ?

তরুণ : চুরি করে নিলে কেন ?

মেয়ে : বেশ করেছি। একশোবার নেবো। কিন্তু কী নিয়েছি ? কোথেকে নিয়েছি, কখন নিলাম ?

তরুণ : আর ন্যাকা সাজতে হবে না।

মেয়ে : না বুঝলেও ক্ষতি নেই জানি, তবু বল না ছাই কী নিয়েছি।

তরুণ : চকলেটের বাক্স।

মেয়ে : চকলেটের বাক্স ?

তরুণ : জি। আমার এই সাইকেলের বাস্কেটে ছিল।

মেয়ে : এখন নেই ?

তরুণ : কী করে থাকবে ?

মেয়ে : নাই থাকল। কিন্তু এখন কী হবে ?

তরুণ : তুমি আমার সঙ্গে যাবে।

মেয়ে : কোথায় ?

তরুণ : কারফিউর কালো সাগর পাড়ি দিয়ে, পাশের গলির একটা মাঝারি গোছের বাড়িতে।

মেয়ে : তোমার বড় আপা যদি ঝেঁটিয়ে বের করে দেন ?

তরুণ : আমি তার সঙ্গে পরামর্শ করেই এসেছি।

মেয়ে : তোমার বড় দুলাভাই ?

তরুণ : বড় আপার চিরানুগত। কথা বাড়িয়ে আরো দেরি করবে, না চলবে ?

(মেয়েটি কী ভাবে)

বাবাকে আর মন্টুকে বোঝাবার ভার আমার উপর রইল।

মেয়ে : এক সেকেন্ড দাঁড়াও। টেবিলের উপরে একটা বই আছে, তুলে নিয়ে আসি।

(মেয়েটি ঘরে ঢুকেই বই হাতে বেরিয়ে আসে। দরজাটা বার থেকে ঠেলে দেয়। অন্ধকার গাঢ়তর হয় মঞ্চে।)

তরুণ : পড়ার বই নাকি ? কেবল আমিই অমানুষ ? তুমি এই মুহূর্তেও পরীক্ষার পড়া তৈরির কথা মনে রাখতে পারছ ?

মেয়ে : না। বইটাতে এক টুকরো কাগজ ছিল যা ফেলে যেতে চাইনি।

তরুণ : আমার চিরকুট ?

মেয়ে : না। কারফিউ পাস। সংকট মুক্তির জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলাম। মন্টু জোগাড় করে দিয়েছে। আর রাতেও ওর মেয়াদ আছে। বড় আপার নবজাতক শিশুর আমি দাইমা।

তরুণ : ওহ্! কেবল আমিই নিরাপত্তার দাস, অপ্রেমিক! তুমি কি, শমি ?

মেয়ে : কল্যাণী। দেখি তোমার কারফিউ পাসটা। আমার হাতে [illegible] একটুকু পথের মধ্যে কোনো রকম ভুলের মাশুল দিতে আমি রাজি নই

(তরুণ হাতে পাস তুলে দেয়।)

তরুণ : তুমি কী করে জানলে যে আমার কারফিউ পাস আছে ?

মেয়ে : মেয়েরা জানে। সব জানে। তুমি প্রেমিক না হলেও সাংবাদিক, নাইট ডিউটির পর পাস না নিয়ে তুমি বাড়ি ফিরবে- একথা [illegible] যাব কেন ? তাছাড়া তুমি কত বড় বীর, সে'ত আমার অজানা [illegible] শক্ত করে ধরো। তাড়াতাড়ি চল।

(এক হাতে সাইকেল, অন্য হাতে তন্বীর [illegible] প্রস্থান [illegible] মঞ্চের ডানদিক থেকে উদিত হবে ওস্ত[illegible]

ওস্তাদ : পাগলা, ঘুমাস নাকি ?

পাগলা : (ভেতর থেকে) পাগল হইছ, ওস্তাদ ?

ওস্তাদ : তাড়াতাড়ি উইঠা আয়।

পাগলা : (ভেতর থেকে) আব দুগা মুখে দিয়া লই। জবব চিজ।

ওস্তাদ : হারামী কয় কী ? জব জব কইরা কী চিবাস তুই ?

পাগলা : (ডাস্টবিনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে হাতের প্যাকেট তুলে ধরে।) দুগা তুমিও খাও। জবর চিজ। এ্যংরাজীতে চকোলেট কয়। খুব ভালো জিনিস। সাইকেলের বাস্কেটের থন তুইলা ভিতরে ফালাইয়া বাখছিলাম।

ওস্তাদ : ফালাইয়া রাখ। এখন কাম কর।

পাগলা : তুমি বুঝি এখন মিঠা কিছু খাইবা না ? বুঝছি। চল, কাম করি।

ওস্তাদ : আইজ সব বরবাদ হইয়া যায় বুঝি। এত বাধা পড়লে কাম করন যায় ? ল, দেশলাই ঠিক কইবা ল। আমি দোকানের তিন মুড়া ত্যাল ঢাইলা বাইর অইয়া চইলা যামু। তুই লগে লগে আগুন লাগাইয়া কাইটা পড়বি। হুনছস।

পাগলা : ওস্তাদ আগুন দিমু ক্যামনে, ম্যাচবাত্তি আছে ?

ওস্তাদ : হারামজাদা কয় কী ! আমি বিড়ি সিগারেট খাই যে ম্যাচবাত্তি লইয়া ফিরমু। তোরটা কী হইল ?

পাগলা : অউগা কাঠি ছিল। তখন সিগারেট ধরাইলাম যে।

(ওস্তাদ মাথা চাপড়ে ডাস্টবিনের মধ্যে বসে পড়ে।)

চিন্তা কইর না। তুমি ত্যাল ঢাল, আমি দ্যাশলাই লইয়া আইলাম বইলা।

(প্রস্থান।)

ওস্তাদ : (লাফিয়ে বার হয়।) পাগলা সব ডুবাইব। কই যাইতে কই যায়, কে জানে ? ঐ দেখি আবার ট্রাকের আওয়াজ। পাগলা খাড়া। আমি আই। (প্রস্থান।)

(দূরাগত মিলিটারী ট্রাকের শব্দ নিকটবর্তী হয়। ঠিক গলির মুখে থামল মনে হয়। একজোড়া টর্চ চোখ ধাঁধানো আলো ফেলে বন্ধ গলিতে। মিলিটারী পোশাকে দু'জন লোক প্রবেশ করে। এদিক ওদিক দেখে। তেলের টিনটা নজরে পড়ে। তুলে নিয়ে চলে যায়। যাবার আগে রাস্তার নাম ঠিকানা নোট বইতে টুকে নেয়। বিরতি। স্তব্ধতা। পা টিপে টিপে ওস্তাদ আর পাগলা আবার প্রবেশ করে। বুঝল তেলের টিন কারা গায়েব করেছে। কপালে করাঘাত করে বাণী উচ্চারণ-)

ওস্তাদ : শালারা কওমের খেদমত করবার দিল না!

[যবনিকা]

বংশধর

চরিত্র

বাবা

আশরাফ

পুলিশ অফিসার

দমকল বাহিনী অফিসার

দমকল বাহিনীর দু'জন কর্মী

মা

আমেনা

[মধ্যবিত্ত পরিবারের পরিচ্ছন্ন ঘর। মধ্যখানে চায়ের টেবিল। ঘরের পেছনের দেয়ালে একটা জানালা, একটা দরজা। এই দিকেই বারান্দা এবং রান্নাঘর-এ যাবার পথ। এক পাশে বাইরে যাবার দরজা। এই দিকেই সিঁড়ি।]

বাবা : সেই বাঁদরটা কি আজও এসেছে নাকি ?

মা : রোজই তো আসছে।

বাবা : কখন আসছে ?

মা : সকালে-বিকালে-দুপুরে, যখন পারছে তখনই লাফিয়ে ঢুকে পড়ছে। ওই বজ্জাতের আবার সময়-অসময় আছে নাকি ?

বাবা : বল কী, এতদূর গড়িয়েছে! হতভাগার এতবড় দুঃসাহস!

মা : তুমি তো আমার কোনো কথাই মনোযোগ দিয়ে পুরোপুরি শুনতে চাও না। নইলে, গতকাল দুপুরে যে কাণ্ডটা ঘটে গেল, মনে হলেও সারা গা শিউরে ওঠে।

বাবা : কাল দুপুরে কী হয়েছে ? সব কথা খুলে বল।

মা : বলছি। আমেনাকেও আসতে দাও। তোমার জন্য নাস্তা তৈরি করছে। ও আসুক। ওর সামনেই সবটা বলা দরকার।

বাবা : ওর সামনে বলার কোনো দরকার নেই। আগে সবটা আমাকে খুলে বল।

মা : তোমার সবটাতেই বেশি ব্যস্ততা। বলছি। দুপুর বেলা তুমি অফিসে চলে গেছ। আমেনাও খাওয়ার আগেই ইউনিভার্সিটি থেকে চলে এসেছে। দু'জনে এক সঙ্গে হাত লাগিয়ে খাওয়া দাওয়ার জিনিস গুছিয়ে নিয়ে খেতে বসেছি। ভেতরের বারান্দার দরজা দু'টোই বন্ধ, সিঁড়ির দরজাটাও বন্ধ সব আটঘাট বেঁধে তবে খেতে বসেছি। মেয়েকেও রেখেছি চো[illegible] সামনে।

বাবা : তারপর ?

মা : সবে খেতে শুরু করেছি, বললে বিশ্বেস করবে না, ঠিক সেই সময়ে সি[illegible] দরজায় বাইরে থেকে ঠক্ ঠক্ করে টোকা দিল।

বাবা : এতবড় সাহস বাঁদরটার! আমি বাড়ি থাকব না জেনে, দুপুর বেলা এসে বন্ধ দরজায় টোকা দেয়!

মা : সে কি, তুমি আন্দাজ করলে কী করে ।

বাবা : ওর বাপ মা চৌদ্দগুষ্ঠির খবর রাখি। আর এইটুকু আন্দাজ করতে পারব না ?

মা : কার কথা বলছ তুমি ?

বাবা : কেন ঐ বাঁদরটার। ঐ তোমাদের আশরাফের কথা বলছি।

মা : হায় খোদা, কিসের মধ্যে কি! তোমার সঙ্গে গল্প করাও ঝকমারি। আমি বলছি এক কথা তুমি ভাবছ অন্য কথা। হঠাৎ করে আশরাফের কথা তুললে কেন?

বাবা : তুমি তো বললে দরজায় এসে টোকা দিল।

মা : কে টোকা দিয়েছে তা তুমি জানলে কী করে?

বাবা : কে টোকা দিয়েছিল?

মা : তুমি আমাকে বলতে দিলে তো!

বাবা : নাও, বল, শুনছি।

মা : আমি অন্য কিছু ভাবতেও পারিনি। ভেবেছি, হয়তো পিওন, ফেরিওয়ালা কেউ হবে। আমেনাকে বললাম উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দেখতে। ও হাসিমুখে উঠে গেল।

বাবা : তখনও তোমার সন্দেহ হলো না?

মা : কিন্তু, তারপর যা কাণ্ডটা হলো! দরজা খুলেই ও চিৎকার করে ছিটকে পেছনে সরে এল। চোখ তুলে দেখে আমিও হতভম্ব। সেই কালামুখ হুলো বাঁদরটা। বারান্দার দরজা বন্ধ দেখে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেছে। দু'হাত তুলে এমন এক বিকট ভেংচি কাটল যে, আমেনা তো ভয়ে ছুটে অন্য ঘরে চলে গেল। অত বড় বাঁদরটা এক লাফে ঘরে ঢুকে, খাবার টেবিলে একেবারে আমার সামনের চেয়ারটায় এসে বসল।

বাবা : তোমার মুখোমুখি চেয়ারে এসে বসল?

মা : জুঁঠো হাতেই ভাতের বড় চামচটা মুঠ করে ধরেছিলাম ভেবেছিলাম এক বাড়িতে মাথাটা ফাটিয়ে ফেলব।

বাবা : খুব সাহস করেছ!

মা : পারলাম না। ব্যাটা বজ্জাত। আমি হাত তুলবার আগেই এক ঝটকায় হাতের প্যাচে তরকারির বাটি সাপটে ধরে দুই লাফে খোলা দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাবা : যাক আপদ গেছে। অল্পের ওপর দিয়ে গেছে। তুমি জান না এই বড় বাঁদরগুলো ক্ষেপে গেলে বেশ হিংস্র হয়ে ওঠে।

মা : তোমার দাপট কতদূর সে আমার ভালো করে জানা আছে। যত হম্বিতম্বি ঐ বেচারা আশরাফের ওপর।

বাবা : হ্যাঁ। আমি ওই বাঁদরটার কথা জিজ্ঞেস করছিলাম। গতকালও ও এ বাড়িতে এসেছে নাকি?

মা : জানি না।

বাবা : আজ এসেছিল?

মা : জানি না

বাবা : আসবে না কি ?

মা : জানি না।

বাবা : মেয়েকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলে ?

মা : কী জিজ্ঞেস করব ?

বাবা : রোজ রোজ আসে কেন ?

মা : এক পাড়ায় এক সঙ্গে বড় হয়েছে। ছোটকাল থেকে আসা-যাওয়া করছে।

বাবা : বহুদিন ধরে নিয়মিত আসা-যাওয়া করছে। সেই জন্যইতো বলছি। এবার এখন ওর কিছু বলা উচিত। এবং বলতে চাইলে কিছু করাও উচিত।

মা : কী বলবে ? কী করবে ?

বাবা : বলবে যে, সে আমেনাকে বিয়ে করতে চায়।

মা : হয়তো আমেনাকে বলেছে।

বাবা : না আমাকেও বলতে হবে। এবং তখন আমিও তাকে বলব যে, না, তা হবে না, হতে পারে না। অন্তত যতদিন না সে তার পেশা বদল করেছে। সাংবাদিকের সঙ্গে আমি আমার মেয়ে বিয়ে দেব ? লেখাপড়া শিখে রাতদিন টো টো করে পরের হাঁড়ির খোঁজ করে বেড়াবে এ আমার পছন্দ নয়।

মা : পছন্দ করবে কে, তুমি না তোমার মেয়ে ?

বাবা : তোমার মেয়ের যা বুদ্ধি, সে আবার নিজে বুঝেসুঝে পছন্দ করবে! যদি বুদ্ধি থাকত তাহলে ঐ বাঁদরটাকে এতদিনে মানুষ করে তুলতে পারত।

মা : তা তুমি চেষ্টা করে দেখ না কেন ?

বাবা : তাই করব। ছোঁড়া আজ আসুক! অন্য কারও সঙ্গে নয়, ও আজ কথা বলবে আমার সঙ্গে। ভেবেছে গায়ে ফুঁ দিয়ে ফুরফুর করে ভেসে বেড়াবে, কেউ ওকে কিছু বলতে পারবে না। আজ ওর একদিন কি আমার একদিন। আমাকে পরিষ্কার করে কিছু না বলে এ বাড়ি থেকে ফেরত যেতে পারবে না।

মা : তুমি ওকে খুন করবে নাকি ?

বাবা : দেখ তুমি, আমাকে অযথা ক্ষেপিও না। হ্যাঁ, দরকার হলে তাই করব। খুন। হ্যাঁ, খুনই করব।

(নেপথ্যে আমেনার প্রচণ্ড চিৎকার, ভয়ার্ত আর্তনাদ, হাত থেকে পেয়ালা-বাসন পড়ে যাওয়ার ঝন ঝন শব্দ)

মা : আমেনা ! আমেনা!

বাবা : আমেনা! কী হলো ? (এক সঙ্গে)

(আমেনার প্রবেশ। ভয় [illegible] এক হাতে [illegible] শুদ্ধ কয়েকটা কলা [illegible] থর থর কাঁপছে।)

বাবা : কী ? কী হয়েছে তোর ? চিৎকার করলি কেন ?

আমেনা : বাঁদর। সেই বাঁদরটা। এক হাতে ছোট ট্রেটার মধ্যে নাস্তা, অন্য হাতে এই কলাগুলো ধরে, বারান্দা দিয়ে এই ঘরের দিকে আসছিলাম। হঠাৎ পেছন থেকে আঁচল ধরে টান দিয়েছে। তাকিয়ে দেখি সেই হুলো কালা মুখ বাঁদরটা। ওরও এক হাত আটকা ছিল। কি একটা কাগজের পোটলা ডান হাত দিয়ে সাপটে ধরেছিল। অন্য হাত দিয়ে কলার গোছা থাবা দিয়ে ছিনিয়ে নিতে চাইল। আমি সরে যেতেই মুখের কাছে এসে এক ভেংচি। তারপর বাঁ হাত দিয়ে আমার ট্রের নিচে এমন এক চাঁটি মারল যে সবটা ফির্নি ছিটকে আমার গায়ে-মুখে পড়ে একাকার। আমি চিৎকাব কবে কলাগুলো আঁকড়ে ধরে রেখেছি আর ওই বজ্জাতও টানাটানি করেছে। শেষে কি মনে করে হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে এক লাফে বারান্দা পার হয়ে চলে গেল।

মা : তুই একটু শান্ত হয়ে বোস। মুখটা মুছে ফেল্। খুব বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে।

বাবা : নাঃ আজকে এই বাঁদরটারই একদিন কি আমারই একদিন। খুন, সোজা খুন করে ফেলব আজকে। আমেনার মা, তুমি আমাব বন্দুক আর টোটা বার করে রাখ। আমি একবার বারান্দা দিয়ে ঘুবে আসি। দেখি আশেপাশে কোথাও দেখা যায় নাকি ।

(বাবা বারান্দার দিকে চলে যায়)

মা : তোর বাবা আজ ক্ষেপে গেছে। সত্যি সত্যি একটা কিছু কবে না বসে।

আমেনা : আমি দরজার আড়াল থেকে সব শুনেছি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনেছিলাম। তাইতো বাঁদরটা যে কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে টের পাইনি।

মা : কিছু ঠিক করেছিস ?

আমেনা : আমি কী ঠিক করব মা ?

মা : আহা সব কিছু তোকে ঠিক করতে বলছে কে ?

আমেনা : ওকে আমি বলব কী করে ?

মা : ও কি আজ আসবে ?

আমেনা : রোজই তো আসে। আসবে।

মা : তোর বাপ বড় রেগে আছে। আজ একটা ভালো মন্দ কথা বলাবলি হয়ে গেলেই ভালো হয়।

আমেনা : মা!

(বাবার পুনঃপ্রবেশ। ঘরে ঢুকে বারান্দার দবজা বন্ধ কবে দেবে।)

বাবা : নাঃ। ব্যাটা পালিয়েছে। ধারে কাছে কোথ্থাও দেখলাম না।

মা : বাঁদর ধরার সখ ছিল তো খালি হাতে গেলে কেন ? [illegible] হাতে করে নিয়ে বেরুলেই পারতে, তাহলে হয়তোবা ধবা দি[illegible] বিশ্রাম কব!

বাবা : বাঁদর। সব বাঁদর এক সঙ্গে মিলে আমাকে পাগল কবে দেবে ! (সিঁড়িব দরজায় টোকা পড়ে) কে ? বন্দুক' আমেনার মা, আমার বন্দুকটা!

মা : মশা মারতে কামান দাগতে চাও নাকি ? সাহস থাকে তো একটা লাঠি হাতে নিয়ে এগিয়ে যাও।

আমেনা : হ্যাঁ বাবা, বন্দুক থাক। তুমি লাঠি নিযেই এগিয়ে যাও।

মা : হ্যাঁ তাই কর। লাঠি বাগিয়ে ঠিক দরজা বরাবর দাঁড়াও। আমি ছিটকিনি খুলে, একটানে দরজার ফাঁক করেই পাল্লার আড়ালে সরে দাঁড়াব।

বাবা : রাইট। আমি ওয়ান, টু, থ্রী বললেই তুমি পাল্লা ধরে টান দেবে।

আমেনা : মা!

মা : কোনো ভয় নেই রে। আমি অনেক বাঁদব দেখেছি।

বাবা : ওযান, টু , থ্রী!

(মা দরজা খোলে। আমেনা চিৎকার করে ওঠে। বাবা মাথার ওপর লাঠি উঁচু কবে তুলে ধরেছিল, তুলেই ধরে থাকল। মারতে পাবল না। মা মুখে আঁচল চাপা দিযে হাসল। বাঁদবের বদলে ঘরে প্রবেশ করল আশরাফ। সে একটু হকচকিয়ে গেছে।)

আশবাফ : ঠিক এইরকম সংবর্ধনা লাভেব জন্য তৈরি ছিলাম না। খালুজান কি সত্যি সত্যি আমাকে—

বাবা : না না তোমাকে নয়। আমি ভেবেছিলাম বাঁদর।

আশরাফ : বাঁদব ' যাক বাঁচা গেল। তা বাঁদর না হই বাঁদরের বংশধর তো বটেই'

মা : সে তুমি একা হতে যাবে কেন ?

আমেনা : মা, আমি বান্নাঘবে যাই। আব্বার নাস্তা আরেকবার ঠিক কবে নিয়ে আসি।

বাবা : না তুমি এখানেই থাকবে। আশরাফের সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথাবার্তা আছে। তোমরাও সামনে বসে থেকে শুনবে।

আমেনা : মা!

মা : তোমাব আব্বা নিশ্চয়ই তোমার ভালোর জন্যেই বলছেন।

আশরাফ : আমিও তাই মনে করি। আমি প্রস্তুত। আপনি বলুন।

বাবা : আমি তোমাকে ভালো করে বুঝতে চাই। আজ এখানে কী মনে করে এসেছ। এলোমেলো জবাব দেবে না। সত্যি কথা বলবে।

আশরাফ : শুনতে প্রথম হয়তো খুব হাস্যকর শোনাবে, তবু সত্যি বলছি, বিশ্বেস করুন, আমিও একটা বাঁদরের খোঁজে এসেছি।

আমেনা : বাঁদরের খোঁজে ? বাঁদরের জন্য ?

আশরাফ : দু'তিন ঘন্টা আগে ঘটনাটা ঘটে। এক ব্যবসায়ীর গদি থেকে একটা বাঁদব, এক তাড়া নোটের একটা বড় মোটা বান্ডিল তুলে নিয়ে পালিয়েছে।

বাবা : নোটের বান্ডিল ? কত টাকাব ?

আশরাফ তো মোট দু'তিন হাজার টাকার হবে। সমস্ত শহরময় হৈ চৈ পড়ে গেছে। পুলিশের লোক, ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি, জনতা সব ঐ বাঁদরের তল্লাশে বেরিয়ে পড়েছে।

বাবা : ধরা পড়েছে ?

আশরাফ : কে কাকে ধরে ? হয়তো একবার দেখা যায় কোনো দালানের কার্নিশে লেজ ঝুলিয়ে বসেছে। বান্ডিলটা একটু খুটে দেখে। দু'একটা নোট বাতাসে উড়ে নিচের দিকে পড়তে থাকে। ব্যস আর যায় কোথা। সমস্ত জনতা সেদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, খাবলা দিয়ে ওগুলো ধরবার জন্য। সাধ্য কি ফায়ার ব্রিগেড কাছে ঘেঁসে। ততক্ষণে গোলমালের ভয় পেয়ে বাঁদরটাও নোটের পুটুলি বগলদাবা করে দুই লাফে আরেক দালানের পেছনে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বাবা : বলো কি ? কেউ ধরতে পারল না ?

আশরাফ : সেই তখন থেকে আমিও সকলের পেছন পেছন হোন্ডা নিয়ে ঘুরছি। কিছুক্ষণ আগে মনে হলো বাঁদরটা এই পাড়ায় ঢুকেছে।

মা : বাঁদরটাকে দেখেছ তুমি ? কী রকম দেখতে ?

আশরাফ : ইয়া বড়, কালা মুখ, একটা হুলো বাদর।

বাবা : এ্যাঁ!

মা : নোটের ব্যান্ডিলটা কী রকম ?

আশরাফ : খবরের কাগজ দিয়ে প্যাঁচান। একটা পাঁউরুটির মতো হবে।

বাবা : এ্যাঁ ? আমেনা, তুই ঠিক দেখেছিলি তো ?

আমেনা : আমার কোনো সন্দেহ নেই বাবা। যা ভেবেছো ঠিক তাই।

বাবা : তোমার পেছন পেছন কেউ আসেনি তো ?

আশরাফ : মনে হয় না যে অন্য কেউ লক্ষ করেছে।

বাবা : তোমরা বসো। আমি আরেকবার বারান্দা দিয়ে ঘুরে আসি।

মা : তুমি একা যেও না। আমিও সঙ্গে আসছি।

বাবা : আশরাফ তুমি চলে যেও না। সাহায্যের দরকার হতে পারে। আমরা এক্ষুণি আসছি।

(বাবা মার বারান্দা দিয়ে প্রস্থান)

আশরাফ : কী ব্যাপার ? তোমরা বাঁদরটা ধরেছ নাকি ?

আমেনা : না।

আশরাফ : দেখেছ ?

আমেনা : বাঁদরের কথা থাক এখন।

আশরাফ : ও কি আর বাঁদর রয়েছে, মহাজন বনে গেছে।

আমেনা : সোয়েটারটা পছন্দ হয়েছে ?

আশরাফ : চমৎকার! খুব সুন্দর হয়েছে।

আমেনা : সব কথাই কি আমি বলাব, তারপর তুমি বলবে ? জানালার ফাঁক দিয়ে কী দেখছ ?

আশরাফ : কিছু না, কিছু না। ছাদের কার্নিশ থেকে খয়েরি রঙের কি যেন একটা দুলে উঠল।

আমেনা : ছাদে শুকুতে দেওয়া আমার শাড়ির পাড় হবে।

আশরাফ : সুন্দর। খুব সুন্দর। চমৎকার।

আমেনা : কেবল দূরের জিনিস খুঁজে বেড়াও, কাছের জিনিস ভালো করে দেখতে পাও না ?

আশরাফ : কী যে বল ! তোমাকে দেখার কি কোনো আরম্ভ আছে না শেষ আছে ?

(খুট করে দরজা খুলে অতি সন্তর্পণে বাবা প্রবেশ করে। ঠোঁটে আঙুল চেপে ধরে।)

বাবা : চুপ। কোনো শব্দ করো না। অন্য কোথাও যাযনি। চুপ করে ছাদের কার্নিশে বসে আছে। আমি এই কলাগুলো নিয়ে যাচ্ছি।

আশরাফ : আমি আসব ?

বাবা : না, না। বাইরে আমরা দু'জনেই যথেষ্ট। তুমি আমেনাকে নিয়ে ঘরের মধ্যেই থাক। আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। তোমাকেও পরে দরকার হবে। দরজা জানালা বন্ধ করে চুপ করে বসে থাক।

(কলা নিয়ে বারান্দার পথে বেরিয়ে যাবে।)

আমেনা : ভালো শাস্তি হয়েছে। চুপ করে বসে থাক।

আশরাফ : এ শাস্তি হতে যাবে কেন ? এতো পুরস্কার।

আমেনা : কথা। কেবল কথা আর কথা। ওকি চুপ করে বসে থাকতে হবে বলে কি গালে হাত দিয়ে বসে থাকবে নাকি ?

আশরাফ : বলো আর কী বলবে ?

আমেনা : বেশ আমিই বলছি। দু'দিন পরে আমার পরীক্ষা। বি.এ পাশ করার পর বাবা বোধহয় আর আমাকে পড়াবেন না।

আশরাফ : তাই নাকি ?

আমেনা : আর কিছু বলার নেই ?

আশরাফ : মানে, পাস যে করবেই তার তো কোনো কথা নেই। না করলে নিশ্চয়ই তোমাকে আরও কিছুকাল কলেজে যাওয়া আসা করতে দেবেন।

আমেনা : সেই আশাতেই দিন গুনছ নাকি ?

(খুট করে দরজা খুলে বাবা আবার প্রবেশ করে। ঘরে ঢুকে বারান্দার দিকের জানালার শিকের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে একটা দড়ির মাথা ধরে টানতে টানতে আশরাফের দিকে এগিয়ে আনে)

বাবা : তুমি দড়ির এই মাথা শক্ত করে ধরে রাখ।

আশরাফ : ফাঁস দিয়ে আটকাবেন না কি ? আমার এখনই মনে হচ্ছে বেশ বড় রকমের জমকালো খবর হবে।

বাবা : বাজে বোকো না। কোনো কথা যেন ঘুণাক্ষরেও কারও কাছে প্রকাশ না পায়।

আশরাফ : আমাকে কী করতে হবে ?

বাবা : তুমি এই দড়ির মাথা চেপে ধরে বসে থাক। আমেনার মা রান্না ঘরে লুচি বেলছে। বাঁদরটা কিছুই সন্দেহ করছে না। আমি কলাগুলো, দূর থেকে দেখা যায় এমন জায়গায় গুদামের মধ্যে রেখে এসেছি। এই দড়ির অন্য মাথা গুদামের দরজার কব্জিতে আটকানো রয়েছে। এক হ্যাঁচকা টানে ঝপাৎ করে দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

আশরাফ : কিন্তু কখন টানব ? এই ঘর থেকে কিছুই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

বাবা : বারান্দার অন্য কোণায় বসে আমি খবরের কাগজ পড়তে থাকব। দরজার ফাঁক দিয়ে আমাকে স্পষ্ট দেখা যাবে। ইশারা করতেই তুমি দড়ি ধরে জোরে টান দেবে।

আশরাফ : ঠিক আছে। আপনি যান। কোনো চিন্তা নেই।

(বাবা বেরিয়ে যায়। আশরাফ দরজার ফাঁকে দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ রেখে দু'হাতে দড়ি আঁকড়ে ধরে বসে থাকে)

আমেনা : এখন বোধহয় তোমাকে কোনো কথা বলা বৃথা। অথচ আজ আমি সংকল্প গ্রহণ করেছিলাম, বলব-শুনব।

আশরাফ : সংকল্প আমারও ছিল। আজকের জন্যই। মাঝখান থেকে এই বাঁদরটা এসে সব ওলট-পালট করে দিল।

আমেনা : তবু বল। বল। থেমে গেলে কেন ? যা মনে করে এসেছিলে পরিষ্কার করে বল। সবটা বল। সবাইকে শুনিয়ে বল।

আশরাফ : দোহাই তোমার, আমার মনোযোগ নষ্ট করো না। এখন একটু চুপ করে থাক। পরে। পরে বলব। পরে!

আমেনা : পরে, পরে, পরে। আর কতকাল পরে বলবে ? স্কুল ফাইনাল পাশ করেছি ? একাদশ শেষ হয়েছে, দ্বাদশ শ্রেণী পার হয়েছি। প্রথমবর্ষ বি.এ শেষ হয়েছে, শেষ বর্ষও সমাপ্ত হলো বলে। আর কতকাল, কতকাল পরে বলবে ?

(বারান্দার ইশারা পাবামাত্র আশরাফ প্রবল জোরে দড়ি টানে। মুখ দিয়ে একটা উত্তেজনাসূচক শব্দ বার হয়। বাইরে দড়াম করে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ, কিছু থালা ঝন্ ঝন্ ঝন্ করে পড়ে ভাঙ্গে, বাবার হর্ষোৎফুল্ল জয়ধ্বনি শোনা যায়। কেবল আমেনাই নিরব ও স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। বাবা প্রবেশ করে)

বাবা : কেল্লা ফতে। দড়ি খুব টেনেছ। বাছাধন ঘরে ঢুকে কেবল কলার কাঁদিতে হাত রেখেছে, অমনি চোখের পলকে পেছনের পাল্লা দু'টো আটকে গেল।

(আম্মার প্রবেশ, নাস্তাসহ)

মা : এবার সবাই একটু শান্ত হয়ে বসো। নাস্তা খাও। তোমাকেও আর ওই দড়িটা ধরে বসে থাকতে হবে না। আমি আসবার সময় গুদামের দরজায় তালা দিয়ে এসেছি।

বাবা : বাঃ, বাঃ। তোমার যেমনি সাহস তেমনি বুদ্ধি। আমি বরাবরই স্বীকার করে এসেছি। তা বাঁদরটা কি করছে দেখলে ?

মা : কোনো চিন্তা ভাবনা নেই। পুটুলিটা পাশে ফেলে রেখে নিশ্চিন্ত মনে কলা গিলছে। খাও তোমরাও শুরু করো। খাও।

(বাবা তবু একবার আহ্লাদিত চিত্তে দড়ির প্রান্ত নাড়াচাড়া করে। সবাই খেতে আরম্ভ করে। সিঁড়ির দরজায় টোকা পড়ে।)

বাবা : কে ? কে ?

নেপথ্যে : দরজাটা খুলুন বলছি।

(আশরাফ খুললে ঘরে ঢুকবে পুলিশ অফিসার)

পুলিশ : মাফ করবেন, বাড়ির ভেতরে না ঢুকে উপায় ছিল না। বাঁদরের কেসটা আমার কাঁধে পড়েছে। আপনারা বোধহয় জানেন যে দুপুরবেলা একটা বাঁদর নাকি কয়েক হাজার টাকা নিয়ে উধাও হয়।

বাবা : তাই নাকি ?

পুলিশ : আপনি না জানলেও আশরাফ সাহেব জানবেন না একথা বিশ্বাস্য নয় ?

মা : ভালো করে বসুন। এক পেয়ালা চা খান।

পুলিশ : অনেক ধন্যবাদ। খবর পেলাম বাঁদরটা নাকি এই পাড়াতেই ঢুকেছে।

বাবা : আপনি কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছেন।

পুলিশ : সে-জন্য আমি খুব দুঃখিত। তবে সব বাড়ির ভেতরে খানাতল্লাসী চালাবার অনুমতি আমি নিয়ে এসেছি।

বাবা : সে-রকম অনুমতি সংগ্রহ করার কারণ ?

পুলিশ : মানে, এ কেসটার সেটাও একটা স্বতন্ত্র এ্যাংগেল। ধরুন এমনও হতে পারে যে বাঁদরটা আসলে কারও পোষা বাঁদর। বেশ শিক্ষিত। সারা দুনিয়া চড়ে বেড়ায় বটে কিন্তু রোজই এবার করে ডেরায় ফিরে আসে।

(আশরাফ হেসে ওঠে)

ও কি আপনি হেসে উঠলেন যে ?

আশরাফ : না না, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি হেসেছি অন্য কারণে। আপনার সিদ্ধান্ত যে জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োগ্য সে-কথা মনে পড়ে যাওয়াতে খুশি হয়ে উঠেছিলাম।

আমেনা : তোমার রসিকতা এখন এখানে খুবই বেমানান!

পুলিশ : এই দড়িটা কীসের ?

বাবা : এ্যাঁ! দড়ি ?

পুলিশ : হ্যাঁ! এই দড়িটা।

বাবা : ওহ্ ? দড়ি ? ওটা মানে আমাদের একটা পোষা বঁ-গোঁ-গরু আছে তার গলার দড়ি।

(বারান্দার দরজায় টোকা পড়ে)

কে ? ওখানে কে ? এ্যাঁ-বেরিয়ে পড়েছে নাকি ? কে ?

(দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে দমকল বাহিনীর একজন অফিসার।)

দমকল : মাফ করবেন, আগে অনুমতি নিতে পারিনি বলে খুব দুঃখিত।

বাবা : আপনি কোথ্থেকে এলেন ? কী করে এলেন ?

দমকল : মই লাগিয়ে ছাদের ওপর চড়ে ছিলাম, তারপড় সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছি।

পুলিশ : মই দিয়ে একবারে ছাদের ওপর পর্যন্ত ওঠা যায় নাকি ? বেশ বাহাদুরি আছে বলতে হবে। তা কিছু দেখলেন ?

দমকল : কার্ণিশ থেকে লাফিয়ে ঘরে ঢুকল মনে হয়। হয়তো কোথাও লুকিয়ে রয়েছে।

পুলিশ : ভাঁড়ার ঘর, গুদাম এগুলো দেখেছেন ?

দমকল : একটা ঘরে বাইরে থেকে তালা দেয়া।

মা : আমি দিয়েছি। ওটা আমাদের গুদাম। একটা বাঁদর কলা খেতে ঢুকেছিল। দরজা আটকে তালা দিয়ে রেখেছি। এই বাঁদরটাকে খুঁজছেন কি না গিয়ে দেখে আসুন।

(বারান্দার জানালায় আরও দুজন ফায়ারব্রিগেড কর্মীর মুখ দেখা যাবে।)

কর্মী (১) : ধরা পড়েছে স্যাব। ঐ বাঁদরটাই । গুদামের মধ্যে।

কর্মী (২) : নোটের বান্ডিলটা খুলে ফেলেছে। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে খামচা-খামচি করছে। ছিঁড়ে ফেটে সব নষ্ট না হয়ে যায়।

পুলিশ : কী সাংঘাতিক কথা ! আব সময় নষ্ট করা যায় না।

(হাতে পিস্তল বার করে নেয়।)

মা : থাক, বাঁদরের ওপর আর বাহাদুরি দেখাতে হবে না। এই ধরুন দরজার চাবি। ফায়ারব্রিগেডের লোকের কাছে নিশ্চয়ই জাল আছে। ওরা ধরে দেবে।

দমকল : উনি ঠিকই বলেছেন। কোনোও অসুবিধা হবে না। আপনি আসুন।

পুলিশ : আপনাদের সহযোগিতার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। দরজা-জানালা বন্ধ করে বসুন। আমরাও আর দেরি করব না। শেষে বেশি ভিড় জমে যাবে। কাজ শেষ হলে আমিও ওদের সঙ্গে মই দিয়ে নেমে যাব। দর্শকদের জন্য বেশ ড্রামাটিক হবে। চাই কি আশরাফ সাহেব বলে দিলে কাগজে ছবি পর্যন্ত

বেরিয়ে যেতে পারে। থ্যাংকস। গুড বাই।

(ফায়ারব্রিগেড ও পুলিশ অফিসার বেরিয়ে যায়)

বাবা : ওরা খুঁজে বার করত, করত ! সব কথা তুমি বলে দিতে গেলে কেন ?

মা : হ্যাঁ, আমরা চুপ করে থাকি আর ওরা ঘরের ভেতর থেকে টাকাসহ বাঁদব বার করে বলুক যে সবই আমাদের বাঁদরের কারসাজি। আমাদের ইশারায় করেছে।

আশরাফ : খালাম্মা ঠিকই বলেছেন। তার ওপর আবার দেখে গেছে যে আমরা দড়ি ধরে বসে আছি।

আমেনা : থাক তোমাকে আর কথা বলতে হবে না। বসে রয়েছ কেন ? যা ইচ্ছে হচ্ছে তাই করগে। বেরিয়ে যাও। নিচে গিয়ে দাঁড়াও। সবটা ঘটনা ভালো করে দেখ। না দেখলে বাড়িয়ে বাড়িয়ে লিখবে কী করে ?

আশরাফ : যাচ্ছি। তবে যাবার আগে কয়েকটা কথা বলে যেতে চাই।

আমেনা : আমার মাথা ধরেছে। আমি ভেতরে গিয়ে একটু শোব মা।

মা : এই গোলমালের মধ্যে শুয়ে কোনো লাভ আছে না কি ? সবাই চলে যাক তারপর দেখা যাবে। এখন এইখানেই বোস'

আশরাফ : ও না শুনতে চায় না শুনুক। আপনি আর খালুজান শুনলেও চলবে। বিশেষ করে আপনাদেরকে বলব বলেই আজ আমি ঠিক করে এসেছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, রোজই প্রায় ঠিক করে আসি যে, আজই বলব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে উঠি না। আমার কৈশোর থেকে অতি-চেনা এই পবিবেশে, আপনাকে, খালুজানকে একটা প্রস্তাবের কথায় টেনে নিয়ে আসাব সাহসই হতো না। কেমন যেন নাটুকে এবং অস্বাভাবিক মনে হতো। কিন্তু আজকের এই সম্পূর্ণ এক অবাস্তব পরিবেশেব মধ্যে পড়ে আমার প্রত্যাহেব সংকোচ কিছুক্ষণের জন্য হলেও ভেঙ্গে-চুরে গেছে। মনে হচ্ছে, বললে এখনই বলা সংগত।

মা : ওগো শুনছ। আশরাফ তোমাকে কিছু বলতে চাইছে।

বাবা : বাঁদরটাকে বোধহয় এতক্ষণে জালবন্দি করে ফেলেছে।

মা : আশবাফ কী বলতে চাইছে শোন।

বাবা : ক ? আশরাফ ?

আমেনা : মা আমি সবার জন্য আরেকবার চা কবে নিয়ে আসি ?

আশরাফ : আমি কিছু কথা বলতে চাইছিলাম। স্পষ্ট করে বলতে চাইছি।

বাবা : থাক। আজ থাক। আজ মনটা ঠিক নেই। আরেক দিন। আরেক দিন শুনব!

আমেনা : বাবা !

মা : তা বাবা আশরাফ তোমার অত ব্যস্ত হওয়ার কী আছে। আজ না হয় কাল

যখন খুশি বলো। বলা না বলায় কী এসে যায়। তোমাকে কি আমরা জানি না।

আশরাফ : খালাম্মা দোয়া করবেন। আপনাদের স্নেহ, ভালোবাসা থেকে যেন কোনোদিন বঞ্চিত না হই।- ওই যে, বোধহয় বাঁদরসহ মই বেয়ে নামছে। আমি আসি। আমেনা কালকে আবার আসব। তখন কথা হবে। চলি।

(ছুটে বেরিয়ে যায় বাবা জানালায় মুখ রাখে। আমেনা দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। মা চায়ের জিনিস গুছিয়ে রাখে।)

[যবনিকা]